বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা বারো

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
৯৯।১এল, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪
প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই

ঢোঁড়াই চরিত মানস : ১ম চরণ ॥ ২য় চরণ * চিত্রগুপ্তের ফাইল

জাগরী * গণনায়ক * সত্যি ভ্রমণকাহিনী * অপরিচিতা

অচিন রাগিণী * জাগরী (কিশোর সংস্করণ)

চকাচকী

এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।

ধামদাহা-হাটের 'চকাচকী'। চকাচকী নামটি আমারই দেওয়া— যদিও সে-নাম পরে জেলাসুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটি। ঠাট্টা করে নয়; ভালবেসে। হয়তো একটু ঈর্ষাও মেশানো ছিল ঐ নামকরণের সঙ্গে। অদ্ভুত অবস্থায়, তাদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে তখন আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই রাজনীতিক কাজের সূত্রে। মুসাফিরলালই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ধামদাহা-হাটের দুবে-দুবেনীর কুটিরে। তখন সেখানে ঘোড়ার দড়ি নিয়ে, হাসি চেঁচামেচির মধ্যে, পুরোদমে টাগ-অব-ওয়র খেলা চলছে। দড়ির একদিকে দুবেজী, অন্যদিকে দুবেনী আর অবাধ্য ঘোড়াটি। হেঁইও জোয়ান!...ব'লেই দুবেজী হঠাৎ দড়ি ছেড়ে দিল। দুবেনী একেবারে চিতপাত। তবু হাসি থামে না।

দুবেজী নির্দোষিতার ভান করে।—"জানোয়ারেরা সুদ্ধ তোর দিকে, তোর সঙ্গে কি আমি পারি। তাই হার মেনে ছেড়ে দিলাম।"...

"দাঁড়াও না! তোমার জানোয়ারগিরি বার করছি!"...

এর জের আরও চলত কি না জানি না। আমরা গিয়ে পড়ায় তখনকার মত বন্ধ হয়ে গেল। ছারপোকাভরা দড়ির খাটিয়াটি, আমাদের জন্য বার করতে ছোটে তারা দু'জনে।...

দুবেনীর বয়স তখনই বছর ষাটেক। তবু কি সুন্দর দেবীপ্রতিমার মত চেহারা! যেমন রূপ, তেমনি গায়ের রঙ।...আর কি আপন-করে-নেওয়া ব্যবহার! আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিল বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি, বিয়ের সময়ের মনের উপচে-পড়া-ভাব বজায় রেখেছে দেখে।

তাই নাম দিয়েছিলাম চকাচকী।

বিশ্বনিন্দুক মুসাফিরলালের পছন্দ হয়নি নামটি। কুটিলতায় ভরা তার ভাল চোখটি একটু টিপে, ঠোঁটের কোণে একটা ইঙ্গিতের ছাপ ফুটিয়ে তুলে সে বলেছিল, —"চকাচকী না ব'লে, চড়ুই-চড়ুইনী বলুন এদের। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ীর, এখনও কি ছমক! ছেঁদো কথার কি বাঁধুনি! দেখেন না নেচে চলে! ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুই পাখির মত! এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে একটা লোটা আর এই দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে, দুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল—শুধু দুবেনীর কোমরের লচক দেখে। সে বয়সে দুবেনী..."

মুসাফিরলালকে থামিয়ে দিই। জানি তো তাকে। দুবেনীর সম্বন্ধে ও সুরে কথা বলা আমার খারাপ লাগছিল। সব জিনিসে সে খারাপের গন্ধ পায়!...

এর পর কতবার যে তাদের বাড়িতে গিয়েছি তার ঠিক নেই। না গিয়ে কি নিস্তার ছিল? ওদিকে গিয়েও তাদের বাড়িতে যাইনি

জানতে পারলে চকাচকী দুঃখিত হ'ত। শুধু আমি নই, এ অঞ্চলের প্রত্যেক রাজনীতিক কর্মীর বেলায়ই ঐ এক নিয়ম। দল-নিরপেক্ষ-ভাবে। তার কুঁড়েতে যা জুটবে, চারটি না খেলে রক্ষা নেই। না-খাওয়ার রকম-সকম দেখলে, অতিথির কাপড়-গামছার ঝুলিটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে দুবেনী রাখবে রান্নাঘরে। যদি কোনদিন বলেছি, 'অমুক গ্রাম থেকে এখনই খেয়ে আসছি—আজ আর খাব না' ; অমনি দুবেজী অভিমান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু দুবেনী চুপ করে থাকবার পাত্রী নয়। বেতো টাট্টু ঘোড়াটার পিঠ থেকে চটের বোরাটা সে নেয় বাঁ হাতে ; আর ডান হাত দিয়ে আমাকে ধরে টানতে টানতে উঠনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হুকুম করে, "ব'স এই বোরাটার উপর। বসে বসে দেখ, আমি কেমন করে রুটি সেঁকি।" তারপর দুবেজীকে লক্ষ্য করে বলে, "মরদ দেখ! মান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন! থাকো! সবাই কি আর দুবেনী, যে তোমার মানের কদর দে. . :"

কতক্ষণ আর কথা না বলে থাকে দুবেজী। "রাঁধবার সময় মেলা বকিস না, বুঝলি! মুখের থুতু ছিটকে অতিথের রুটির উপর পড়বে।"

"থামো থামো! অত আর থুতু ছিটকোয় না! এ কি তোমাদের মত থয়নিগোঁজা মুখ, যে কথা বললে থুতুর ভয়ে বাঘ পালাবে। বুঝলে বাবুজী, আমি এক এক সময় বুড়োকে বলি যে, আমার সম্মুখে বসে বাজে বক বক না করে যদি সে হাটের মালিকের তরকারী ক্ষেতে ব'সে আকাশের সঙ্গে কথা বলে তাহ'লে শাকসব্জীর পোকামাকড় দু-চারটে মরে, তামাক-গোলা থুতুতে। তা কি শুনবে। যত গল্প ওর আমারই কাছে।"...

নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়াতে দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের জন্য ?

জবাব দিয়েছিল—"আপনাদের সেবা করলে রামজী খুশী হবেন। তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদের পাপ খণ্ডন হবে কি করে?"

এমন সরল নিষ্পাপ দম্পতিও পাপের ভয়ে আকুল! তাই রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও রাজনীতিক কর্মীদের জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব খরচ করে দেয়! শুনে আমার আশ্চর্য লেগেছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রইল না, যখন চকাচকী জেলে যাবার হুজুগ তুলল। তখন একটি রাজনীতিক আন্দোলনে জেলে যাবার হিড়িক উঠেছে দেশে। ঠাট্টা করে তাদের বলি, "ভেবেছ যে জেলে গিয়েও তোমরা এক সঙ্গে থাকবে? সে গুড়ে বালি! ঢুবেনীকে যে পাঠিয়ে দেবে মতিহারীর মেয়েদের জেলে!"

"রামজীর মনে যা আছে, তা তো হবেই।"—এক গাল হেসে জবাব দিয়েছিল ঢুবেজী।

রামজীর মনে কি ছিল তিনিই জানেন; হিসাব গুলিয়ে দিল থানার দারোগা। ঢুবেনীকে যথাসময়ে পুলিস জেলে ধরে নিয়ে গেল; কিন্তু বাহাত্তুরে বুড়ো ব'লে ঢুবেকে গ্রেপ্তার করতে বারণ করলেন দারোগাসাহেব। সে পরিচিত প্রত্যেকের দুয়ারে গিয়ে মাথা কোটে, দারোগা সাহেবের কাছে একটু তদ্বির করে, তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার জন্য।

কিছুতেই কিছু হ'ল না।

দিন কয়েক পর দেখা গেল ঢুবেনী গভর্নমেণ্টের কাছে মাফ চেয়ে মুচলেকা লিখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এ নিয়ে একেবারে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল। চত্তুইনীর বেহায়াপনায় সবচেয়ে মর্মাহত হ'ল কানা মুসাফিরলাল। তার বিশ্বাস ঢুবেনী, ঢুবেজীকে ছেড়ে না থাকতে পেরেই বেরিয়ে এসেছে।·· এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও?···

দুবেনী কারও ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটি কথারও জবাব দেয়নি। শুধু তার দৈনিক রামজীর পূজো আগের চেয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর দুবেজী ছেড়ে দিল লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা।

আমার সঙ্গে দুবেজীর অন্তরঙ্গতা ছিল সবচেয়ে বেশী। 'নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি'—বাঙালী কবির এই পদটির মানে তাকে বুঝিয়ে, হেসে জিজ্ঞাসা করি, "দুবেনীরও কি তাই?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে পালটা প্রশ্ন করে—"রামজীরও কি সীতাজীর জন্য এমনি হ'ত নাকি?"

"সে কথাতো বলতে পারি না; তবে শ্রীকৃষ্ণের হ'ত রাধিকার জন্য।"

"আরে কিষুণজী-ভগবানও যা, রামজীও তাই।"

আমি নাছোড়বান্দা। আবারও জিজ্ঞাসা করলাম—

"জেলে এঁটোকাঁটার বাছবিচার নেই বলেই কি দুবেনী থাকতে পারল না সেখানে?"

এত অপ্রতিভ দুবেজীকে এর আগে কখনও হতে দেখিনি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কাঁচুমাচু মুখে উত্তর দেয়—"আপনার কাছে বলেই বলছি আসল কথাটা। জেলে গেলে পাপমোচন হয় রামজীর চোখে। সেই জন্যই আমাদের জেলে যাবার এত আকাঙ্ক্ষা। দুবেনী বলে যে, জেলে গিয়ে পাপ খণ্ডন করতে হ'ত আমাদের দুজনকেই; কিন্তু তোমার কপালে যে রামজী তা লেখেন নি। আমাদের দুজনের জীবন যখন একসঙ্গে গাঁথা, তখন আমার একার পাপমোচনের চেষ্টায় কি হবে? তাই দুবেনী মাপ চেয়ে বেরিয়ে এসেছে।"

দুবেজীর চোখ ছলছল করছে। হতাশার ছাপ চোখে মুখে সুস্পষ্ট। যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। গলার স্বর অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।...' রামচন্দ্রজী যে কিছুতেই তাদের দোষ ক্ষমা করবেন না!...

তাদের মনের এক অজ্ঞাত দুয়ার খুলে গেল আমার কাছে। পুণ্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা নেই, অথচ রামচন্দ্রজীকে খুশী করে পাপমুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল।...আবার পাপমোচনের অনুষ্ঠানটি হওয়া চাই দুজনের এক সঙ্গে; একার চেষ্টা নিষ্ফল হবে! অদ্ভুত! আমাদের জটিল মন দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় না, তাদের সরল মনের যুক্তির ধারা। তবে তার বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

দুবেজীর মনমরা ভাব দিন দিনই বেড়ে চলে এর পর থেকে। বয়সের জন্য শরীর ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছিল আগে থেকেই। এখন যেন আরও তাড়াতাড়ি খারাপ হতে লাগল। রোজগারের কাজে কোনদিনই বিশেষ মন ছিল না। তার পেট চালানোর জন্য যেটুকু না করলে নয়, কেবল সেইটুকুনি ছাড়া। বেতো টাট্টু ঘোড়াটার পিঠে চড়ে কাছাকাছি গ্রামের চাষাদের কাছ থেকে ভ্যারেণ্ডার বিচি, ছোলা, তামাক, সরষে কিনে এনে হাটের গোলাদারের কাছে বিক্রি করা, এই ছিল তার এতকালকার পেশা। এখন সে বাড়ি থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দেয়। গোলাদারকে বলে দিল যে, এই বয়সে ঘোড়ায় চড়ে বেরুনো আর সামর্থ্যে কুলয় না। গোলাদার জিজ্ঞাসা করে—"তবে খাবে কি?"

দুবেজী উত্তর দেয় না। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুশকিল হল দুবেনীরই। দুটি পেটের অন্ন যোগানো সোজা নয়। সে দূর গ্রাম থেকে মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে আসে, আমাদের কাছে দু' চারটে টাকার জন্য। আমরা সাধ্যমত দিই। যখন নিজেদের সাধ্যে কুলয় না, তখন চকাচকীর জন্য অন্য লোকের কাছেও হাত পাতি। আমাদের জন্য তারা অনেক করেছে এক সময়ে, তাদের অসময়ে এটুকুও করব না?......

কিন্তু এ মনের ভাব বেশীদিন রাখা গেল না—তাদের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও। পরের জন্য লোকের কাছে হাত পাততে কতদিন আর ভাল লাগে! কিছুদিন পর এমন হ'ল যে, ঢুবেনীকে দূর থেকে দেখলেই আমরা পাশ কাটাবার চেষ্টা করি। কানা মুসাফিরলাল একদিন বলেই ফেলল তাকে—"এখানে কি টাকার গাছ আছে? আমরা নিজেরাই বলে চেয়ে চিন্তে কোনরকমে কাজ চালাই!...... তোমাদের দেশ কোন্ জেলায়? কখন বলো বালিয়া, কখন বলো সারন, কখনও বলো ভোজপুর! কিছু বুঝেও তা পাই না। নিজেদের দেশে চিঠি লেখ না কেন টাকার জন্য? তিনকুলে কেউ নেই, এমন লোকও হয় না কি পৃথিবীতে?"

ঢুবেনী শুনেও শোনে না মুসাফিরলালের কথা। আমাকে বলে—"আপনাদের ঢুবেজী কী মানুষ ছিল, কী হয়ে গিয়েছে। আমার কথারও জবাব দেয় না আজ ক'দিন থেকে। কি সব বিড় বিড় করে বকে। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর উঠে বসে থাকে হাতুড়ি পেরেক নিয়ে। বলে বর্ষা আসছে; চাল মেরামত করছি।"......

ঢুবের চেয়ে ঢুবেনীর কথাই আমার বেশী মনে হয়, তার বিষাদে ভরা মুখখানি দেখে। তাকানো আর যায় না সেদিকে! বাহাত্তুরেধরা বুড়োর জন্য ছুটো টাকা দিয়ে তখনকার মত নিষ্কৃতি পাই।

তারপর মাসখানেক আর দেখা নেই ঢুবেনীর। টাকা নিতে আসে না দেখে অস্বস্তিই লাগে। প্রত্যাশিত বিপদ না ঘটতে দেখলে হয় না একরকম? মুসাফিরলাল সন্দেহ করল যে, হাটের বুড়ো জমিদারবাবু নিশ্চয়ই টাকা দিচ্ছে ওকে—পুরনো দিনের কথা মনে করে। ভাল চোখটি কৌতুকে ভরা।...তোমরা শুধু দেশ দেশ করেই মরলে—আশপাশের দুনিয়ার পুরনো ইতিহাসের কতটুকু খবর রাখ।...

একদিন ঢুবেনী এল, চোখে জল নিয়ে।

—ঢুবেণীর খুব অসুখ। কিছুদিন আগে হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে, ঢুবেনী বড় রোগা হয়ে গিয়েছে।…"তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর উঠে এসে এই কবজিটি আঙ্গুলের বেড় দিয়ে মেপে বলল—তুই দেড় আঙ্গুল রোগা হয়ে গিয়েছিস! দাঁড়া দেখিয়ে দিচ্ছি পয়সা রোজগার করতে পারি কি না।…ঘোড়ার পিঠে বোরা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। কত মানা করলাম। মাথা কুটলাম পায়ে! শুনল না। সে বুঝ কি এখন আর আছে?……বেশী দূর যেতে হয়নি। পারবে কেন! ঘোড়াটাকে সন্ধ্যার সময় খালিপিঠে ঠুক্‌ঠুক্ করে ফিরে আসতে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠেছে। গোলাদারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ি। সে লোক পাঠাল চারিদিকে। কিছুক্ষণ পরেই পুরানদাহার লোকেরা গরুর গাড়িতে করে ঢুবেণীকে পৌঁছে দিয়ে গেল আমার কাছে। তখন বেহুঁশ একেবারে। ঘোড়া থেকে পড়ে, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা তখনই আপনাদের এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু গোলাদার বিসারিয়ার ডাক্তারকে ডেকে পাঠালে। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন নড়াচড়া করলে রুগী বাঁচবে না।…তারপর থেকে তো চলছেই। চোখ খুললো তিনদিন পরে। জ্ঞানও তেমনি জ্ঞান! ঐ এক-রকমের জবুথবু অবস্থা। না পারে লোক চিনতে, না পারে কিছু বলতে। শুধু তাকায়। আমার দিকে তাকায় কিন্তু আমাকেও চিনতে পারে না। মুখে দুধ দিলে বেশ ঢুক ঢুক করে খায়।……ডাক্তার বলেছে খাওয়াতে বেশী করে। ঘোড়াটাকে বিক্রি করে তো এতদিন ওষুধ পথ্য চলল।… …আপনাদের কাছে আসবার ফুরসতই পাই না, রুগী ফেলে;—আজ মুদীর ছেলেটাকে বাবা বাছা বলে বসিয়ে এসেছি। কে জানে থাকবে কি না এতক্ষণ।…সেইজন্যই 'বাস্'-এ এলাম এক টাকা খরচ করে।"

ঢুবেনীর দুঃখের কাহিনী আর শেষ হয় না। বুঝলাম এখন দরকার টাকার। বেশী টাকার। মেয়েমানুষের চোখে জল দেখলেই

আমি কি রকম অভিভূত গোছের যেন হয়ে যাই। দুঃস্থ রাজনীতিক কর্মীদের সাহায্যের জন্য আমার কাছে একটি 'ফাণ্ড' ছিল। তার থেকে দু'শ টাকা আমি দুবেনীকে দিলাম। তাকে 'বাস'এ চড়িয়ে দিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন মুসাফিরলাল সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে।......পাবলিকের টাকা এরকম নাহক খরচ করা, আর যে কেউ বরদাস্ত করুক, সে করবে না। দুবে জেলে যায়নি, তার স্ত্রী মাপ চেয়ে বেরিয়েছে জেল থেকে—ওরা আবার রাজনীতিক কর্মী হ'ল কবে থেকে ?......

মুসাফিরলাল আমায় শাসিয়ে দিল যে, আসছে মিটিঙে সে এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না।

দিন দুই তিন পরে দুবেজীকে দেখতে গেলাম তাদের বাড়িতে। বাড়ি মানে তো একখানি ঘর—ঘরের দেওয়াল, চাল সব কেরোসিন তেলের টিন কেটে, দুবে-দুবেনীর নিজ হাতে তৈরী করা। দোকান বলো, শোবার ঘর বলো, অতিথি-শালা বলো, ঠাকুরঘর বলো, সব এরই মধ্যে। সেই ঘরখানিকে ঘিরে কুতূহলী দর্শকের ভিড় জমেছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি, ঘরের যে কোণায় রঙীন কাগজের রথের মধ্যে রামজীর মূর্তি আছে, তারই সম্মুখে একটি গরু দাঁড়িয়ে। সুন্দর নধর গাইটি। ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় দুবেজী শুয়ে। চোখ বোঁজা। দুবেনী খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে দুবের একখান হাত ছুঁয়ে রয়েছে ; ডান হাত গরুটির গায়ে। পুরুত মন্ত্র পড়ছে। গোদান করছে দুবেনী। দুবেজীকে ছুঁয়ে থেকে রামচন্দ্রজীকে বুঝোবার প্রয়াস পাচ্ছে যে, গোদান করছে তারা দু'জনে মিলে।

পুরুত চলে গেলে দুবেনীর কথা বলবার সময় হ'ল।

......"দুবেজীর আজ দু'দিন থেকে কোন সাড় নেই। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গোদান করবার। তাই আপনার দেওয়া দুশ

টাকা দিয়ে গরু কিনেছিলাম। জানি না এতেও রামজী আমাদের মত পাপীদের উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন কিনা। ওই মুখে আগেও যেমন হাসি দেখেছি, এখনও তেমনি। মুচকে হাসছেন। ও হাসি দেখলেই আমার ভয় ভয় করে—বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। আমাদের দুজনের পাপমোচনের দরখাস্ত উনি নামঞ্জুর করেছেন বলেই বোধ হয় এই দুষ্টুমির হাসি মুখে! বলছেন—পাপীর মুক্তি কি অত সোজা!”……

……ঢুবেনীরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাপমোচনের চেষ্টা এদের একটা বাতিকের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। টাকা দিলাম ওষুধ পথ্যর জন্য, খরচ করে দিল গোদানে! আমারই ভুল। নগদ টাকা না দিয়ে ঔষধ-পথ্য কিনে দেওয়া উচিত ছিল!…এদের মনের নাগাল পাওয়া দায়!……

ঢুবেজীকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে আসতে মন সরল না। থেকে গেলাম সেখানে সেদিন। বুঝলাম যে, ঢুবেজীর আর দেরি নেই।

সে রাত্রে আমি ঢুবেজীর মাথার কাছে পাখা হাতে, বসে ঢুলছি। আমি থাকায় ঢুবেনী একটু মনে বল পেয়েছে। সে হাত জোড় করে বসে আছে রামজীর রথের সম্মুখে। ধ্যান করছে চোখ বুজে। পাপীদের দরখাস্ত-নামঞ্জুর-করা হাঁসিটি পাছে চোখে পড়বে ভেবে, চোখ খুলতে সাহস পায় না। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হল, কেরোসিন টিন দিয়ে তৈরী ছাপ্পরের উপর, বৃষ্টি পড়ার শব্দতে। রামজীকে প্রণাম করে ঢুবেনী উঠে এল, খাটিয়ার উপর জল পড়ছে কিনা দেখতে।…..

বৃষ্টি পড়বার সময় খাটিয়া মধ্যে মধ্যে সরাতে হয়। এখন বাবুজী আছে। দুজন লোক না হলে খাটিয়া সরানো যায় না। তখন মাটির ভাঁড় রাখতে হয় খাটিয়ার উপর। ভাগ্যিস ও পাগল কদিন থেকে বেহুঁশ হয়ে আছে, নইলে এই রাত দুপুরেই হয়তো বাতিক উঠত, হাতুড়ি পেরেক নিয়ে চালের উপর উঠবার!……

খাটিয়া সরানো হ'ল। কুপীর মৃদু আলোতেও বোঝা গেল ঢুবেনী কাঁদছে।

"বাবুজী, বিপদের সময় তুমি যা করেছ, সে ঋণ আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে তোমার পায়ের জুতো তয়ের করে দিলেও শোধ হবার নয়।"……

আচমকা এই অলঙ্কারবহুল কৃতজ্ঞতা নিবেদনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এ তো ঢুবেনীর স্বাভাবিক ভাষা নয়। অথচ কান্নার ফাঁক দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা কথা! এতক্ষণ ধরে জপে বসেও সে নিজের মনকে শান্ত করতে পারেনি। ঝড় বয়ে চলেছে মনের মধ্যে তার। 'আমাদের গায়ের চামড়া'!…'আমাদের পাপ'!…'আমার' না বলে 'আমাদের' বলা, তাদের চিরকালের অভ্যাস। এখনকার এই বিহ্বলতার মধ্যেও সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়নি!…খাটিয়ার ওদিক থেকে আমারই দিকে আসছে ঢুবেনী! শঙ্কা, দ্বিধা চোখের জলেও ঢাকা পড়েনি। আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।…দ্বিধা কাটিয়ে, চোখের জল ছাপিয়ে, আকুল মিনতি ফুটে উঠল সে চাউনিতে!…বলতে চায় কিছু…অনুরোধ জানাতে চায়।

বলো, বলো, ভয় কি!

আশ্বাসের ইঙ্গিত জানাই। তবু বলতে কি পারে! সব কথা কি বলা যায় সকলকে! অচৈতন্য ঢুবের দিকে আবার একবার দেখে নিল ঢুবেনী—কে জানে যদি তার কথা বুঝতে পারে!…পাখাসুদ্ধ আমার হাতখানি সে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে!

"এ কি কাউকে বলবার কথা। তবু বলছি। তোমাকে ছাড়া আর তো কাউকে দেখি না বলবার মত। একজন কাউকে যে বলতেই হবে! চল্লিশ বছর ধরে চেপে চেপে কথাটা একেবারে জমে পাথর হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে! তবু রামজী ক্ষমা করেন নি আমাদের।…ডাক্তারবাবু

পরিষ্কার না বললেও ঘুরিয়ে বলেছেন যে, রুগী আর দু'-চার দিনের বেশী বাঁচবে না। আমিও সেকথা বুঝতে পেরেছি।...সেইজন্য একটা কথা বলার দরকার হয়েছে তোমার কাছে। শুনে আমাদের কি মনে করবে তাও জানি। তবু বলছি।...আমার কথা রাখতে হবে একটা। রাখবে? আগে কথা দাও, তবে বলব।"...

কথা দিলাম।

"শোন তবে বলি। যে কথা বলিনি চল্লিশ বছর থেকে। পোড়া মুখ! আমি দুবেজীর নিকট আত্মীয়া। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মত বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। যাক, সে সব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও! কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে, তা কি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে না? তবে আর লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য? ছেলের হাতের জল পেলে সে পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যেতে পারে। আমার মন যে তাই বলছে। নিজের জন্য ভাবি না; আমার বরাতে যা লেখা আছে তাই হবে। কিন্তু ওর যে রাস্তা রয়েছে পাপ খণ্ডাবার। তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে যেমন করে হোক নিয়ে এস বাড়ি থেকে! সাহাবাদ জেলা,—সাসারাম থানা—হরকতমাহী গ্রামের পচ্ছিমটোলা। চিঠি দিলে আসবে না। ধরে আনতে হবে। আমি আছি জানলে আসবে না; বলে দিও মরে গিয়েছে; তাহলে এক যদি আসে!...না করো না বাবুজী! আমাকে কথা দিয়েছ!"...

সাংসারিক জীবনের সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। তবু জড়িয়ে পড়লাম এদের নিভৃত পারিবারিক জীবনের সঙ্গে। দিন তিনেক পর সাহাবাদ জেলার এক গ্রামে গিয়ে দুবেজীর ছেলের সঙ্গে দেখা করলাম। নাতিপুতিওয়ালা ঘোর সংসারী লোক। বাবা মৃত্যুশয্যায়

শুনেও আমলই দিতে চায় না প্রথমটায়। রুক্ষ মেজাজ। তার মা বেঁচে আছেন কি না, জিজ্ঞেস করায় রুক্ষ স্বরে জানিয়ে দিল যে, তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্বর্গে গিয়েছেন। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, তাদের বাড়ির জেনানাদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের কৌতূহল সে পছন্দ করে না। বাবার কথা তার মনে নেই, তাই তাকে নিয়েও মাথা ঘামাতে চায় না। বুঝলাম যে, এতদিনকার ভুলে-যাওয়া পারিবারিক কলঙ্কটাকে নিয়ে, সে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাচ্ছে না। তাদের সেই আত্মীয়াটি মারা গিয়েছে, এই মিথ্যা সংবাদটি পেয়েও তার মন ভিজল না। তখন আমি অন্য রাস্তা নিলাম। ডুবেজী সেখানে একজন মস্ত লীডার, এ খবর শুনে একটু যেন তার উদাসীনতা কাটল। তখন ছাড়লাম ব্রহ্মাস্ত্র।—"ডুবেজী সেখানে বাড়িঘর-দোর করেছে। বাজারের উপর দোকান। তুমি না গেলে সে সব সাতভূতে লুটেপুটে খাবে। সেগুলো বিক্রী করে আসবার জন্যও তো তোমার যাওয়া দরকার।"

"বাড়ি কি খাপরার?"

"না। টিনের।"

মিথ্যা বলিনি। বাড়ি যে কেরোসিনের টিন দিয়ে তৈরী, শুধু সেই কথাটি খুলে বললাম না। এই ওষুধেই কাজ হল।

তাকে সঙ্গে নিয়ে এক সন্ধ্যায় যখন ধামদাহা-হাটে পৌঁছলাম, তখন ডুবেজীর শবদেহ বার হচ্ছে। কানা মুসাফিরলালের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। আশপাশের গ্রামের রাজনৈতিক কর্মীদের সে ডাকিয়ে এনেছে। বিস্তর লোক জমেছে। নিশান, শোভাযাত্রা, অ্যাসিটিলিন আলো,—যেমন হওয়া উচিত, তার চেয়েও অনেক বেশী।

আমাদের দেখেই মুসাফিরলাল এগিয়ে এল। তাকে আলাদা দূরে নিয়ে গিয়ে বলে দিলাম যে, এ হচ্ছে ডুবেজীর ছেলে,—তাকে যেন কিছু গোলমেলে কথা না জিজ্ঞাসা করা হয়।

"ছেলে ?"

মুসাফিরলাল অবাক হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় আমাকে শোনাল ঢুবেজীর মৃত্যুর চেয়েও চাঞ্চল্যকর খবর।

"ঢুবেনী পালিয়েছে! আমি এখানে এসেছিলাম পরশু রাতে, তোমার খোঁজে। তখনও ঢুবেনী ছিল। আমাকে রুগীর কাছে বসিয়ে, সে একটা ছুতো করে বাইরে যায়। আর ফেরেনি।······বুঝলে ব্যাপারটা ?...বিদেশে এক কানাকড়িও না নিয়ে যে রোজগারের ধান্দায় আসে, সে কি কখনও বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রথমেই ?...... এসে, মাথা গুঁজবার মত একটা জায়গা করে নিয়ে তবে না লোকে বউ আনে ? আমি চিরকাল বলেছি······"

তার কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার উৎসাহ তখন আমার নেই। বুঝলাম যে, মুসাফিরলাল এখানে আসায় ঢুবেনী হাতে স্বর্গ পেয়েছিল ; সে না এলে রুগীকে একেবারে একা ফেলে বোধ হয় ঢুবেনী পালাতে পারত না ! মুসাফিরলাল এখনও বোধ হয় ভাবছে যে, সে পালিয়েছে রুগীর সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে।... কিন্তু আমি তো জানি !... ঢুবেকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় তার বুক ফেটে গিয়েছে। তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে, সে ঢুবের একার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে !......

একটি ছোট্ট নদীর ধারে শ্মশানঘাট। ভাদ্র মাস। শ্মশানঘাটের কাছটুকু ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে ভরা। যেখানে জল নেই, সেখানে কাশের বন। চিতা জ্বলছে। আলো পড়ে ওপারের অন্ধকারের বুকে কাশফুলের চুনকাম বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঢুবেজীর ছেলে একটিও কথা বলেনি এখন পর্যন্ত ; বোধহয় বাড়ি দেখে হতাশ হয়েছে।...... সকলেই চুপচাপ।......হঠাৎ ওপারের কাশবন নড়ে উঠল—চুনকামের

মধ্যে যেন একটু ফাঁক—স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই—কাশের সমুদ্রের মধ্যে খসখসানির ঢেউটা মিলিয়ে গেল।......

বুঝলাম।......হয়তো আমার সন্দেহ মাত্র! ভুলও হতে পারে! কে জানে!

সকলেই সেইদিকে তাকিয়ে। দুবের ছেলেও।

মুসাফিরলাল বলে—"শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়।" তাকিয়ে দেখি তার ভাল চোখটির উপর চিতার আলো পড়েছে। দরদে ভরা! তার, পরিচিত কুটিল দৃষ্টি গেল কোথায়?

সেও বুঝেছে, আমি যা বুঝেছি। শিয়ালের কথা তুলেছে, যাতে বাকি সকলে আর ও নিয়ে মাথা না ঘামায়—ওদিকে আর না তাকায়।

এই প্রথম কানা মুসফিরলালকে খুব ভাল লাগল; তার ভাল চোখের চাউনিটিকেও।

বৈয়াকরণ

......টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে। ক্লাসে যাবার জন্য এবার প্রস্তুত হতে হয়। একটু যেন তেষ্টা পেয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। এখনই আবার ক্লাসে গিয়ে চেঁচাতে হবে—গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া ভাল। টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে। পাশেই পানের কৌটো। কৌটোটার ভিতর থেকে খানিকটা ভিজা খয়েরী নেকড়া বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই গা ঘিনঘিন করে—দিনরাত দাঁত খোঁটেন মৌলবীসাহেব আঙুল দিয়ে—হাত ধোয়া নেই, কিছু না, সেই হাতেই পান বার করে খাবেন। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই। এই সব অনাচারের মধ্যে রাখা জল খেতে মন সরে না। তাঁর দিককার দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো জল-তুলবার দড়িটা পেড়ে নিলেন পণ্ডিতজী। আর এক হাতে লোটা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পূজা আহ্নিক করেন—শুদ্ধাচারে থাকেন—কুক্কুটাণ্ড দেখলে বমি উঠে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারী চাপরাসীটা জল তুলে এনে দিত। এখানে সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি; জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেন্সন নেবার পর মেয়েস্কুলে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু ক'টা টাকার

জন্য নিজের আচার-বিচার বিসর্জন দিতে আসেননি এখানে। স্কুলের দাইদের হাতের জল কি তিনি খেতে পারেন? লোটা মেজে নিজ হাতে ইঁদারা থেকে জল তুলে, আলগোছে ঢকঢক করে খেয়ে যা তৃপ্তি, তা কি কখনও অপরের এনে দেওয়া জলে পাওয়া যায়?...

আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজীর মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণগোচর হবার পর থেকে অষ্টপ্রহর তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। বাক্য নয়, বাক্যের একটি শব্দ। না না, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই; এ হচ্ছে নিছক একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। মনের এই অস্থিরতার জন্য পণ্ডিতজী আজকাল নিজে উপযাচক হয়ে মৌলবীসাহেবের সঙ্গে বেশী করে গল্প করা আরম্ভ করেছেন।

...আর যদি তিনি স্কুলের দাইদের হাতের জল খেতেনও, তা হলেও কি এখান থেকে চেঁচিয়ে দাইকে ডেকে এক গ্লাস জল আনতে বলতে পারতেন?......

"মৌলবীসাহেব, কোন একটা কাজে এখান থেকে দাই, দাই, বলে চীৎকার করতে লজ্জা করে না?"

"লজ্জা মনে করলেই লজ্জা। দাই বলতে দ্বিধা হয় তো হরখুরমা বলে ডাকলেই পারেন।"

......মৌলবীসাহেব ঠিক বুঝতে পারেননি কেন এই দ্বিধা, কিসের এই লজ্জা। সে দ্বিধাটুকু ওঁর মনে জাগে না যে কেন, তাই আশ্চর্য! ......দ্বে বিধে—দ্বিধা—তদ্ধিতান্ত শব্দ।......

"মেয়ে স্কুলের পুরুষ শিক্ষক। আমাদের অবস্থাটা এখানে একটু কেমন কেমন না?"

আফিংখোর মৌলবীসাহেব এতক্ষণে চোখ খুললেন পণ্ডিতজীর কথার সমর্থনে একটু রসিকতা করবার জন্য।

"আপনাদের সানস্‌কির্তে আছে না—হাংস মাধ্যে বগুলা যথা—তেমনি আর কি আমরা এখানে।"

না। ঠিক এই ভাবটার কথা পণ্ডিতজী বলতে চাননি। তবু মৌলবীসাহেবের কথার প্রতিবাদ সোজাসুজি করতে পারলেন না। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ভুলে একটু খোঁচা দিয়ে কথা বললেন।

"আপনাকে আর বক বলি কি করে। বকের পালকের মত আপনার সাদা চুল আর দাড়ি, আবার ভ্রমরের মত কালো হয়ে উঠেছে। আপনি বক কেন হতে যাবেন—আপনি হলেন ভ্রমর।"

সম্প্রতি মৌলবীসাহেব আবার আর একটা নতুন বিবি ঘরে আনবেন ঠিক করেছেন। কালো কুচকুচে দাড়িগুলোর মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—"হাতী চলে বাজারে, কুকুর ডাকে হাজারে।"

"কিন্তু বুঝলেন কিনা মৌলবীসাহেব—সেই হাতী যখন পাঁকে পড়ে……"

মৌলবীসাহেব কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না।

"আপনি চুল সাদা রেখেছেন বলে বলছেন। না? বগুলা-ভকত (বক ধার্মিক) দেখতে সাদাই হয়।" নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল মৌলবীসাহেব। সে হাসিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেও পারলেন না পণ্ডিতজী। বকধার্মিক শব্দটা তীরের মত তাঁর মনের গভীরে গিয়ে বিঁধেছে। আজ দুই মাস থেকে যে কথাটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, তারই সঙ্গে যেন বকধার্মিক কথাটার সম্বন্ধ আছে। আচমকা একটা স্পর্শকাতর জায়গায় ঘষটানি লেগেছে। মৌলবীসাহেব নিজের খেয়াল-খুশীতেই অষ্টপ্রহর মশগুল; পণ্ডিতজীর মুখ-চোখের চকিতের বৈলক্ষণ্য তাঁর নজরে পড়ল না। তাঁর টেবিলেতোলা নড়ন্ত পা দুটোকে দেখে হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল পণ্ডিতজীর মন। চাকরির জীবনে অনেক

কিছুই গা-সওয়া করে নিতে হয়। এখানে আসা থেকে অনেক কিছুই সইয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে। মেয়েস্কুলে, তাঁদের গতিবিধি অবাধ নয়; সর্বত্র বাঞ্ছিতও নয়। স্কুলঘর থেকে একটু দূরে তাঁদের এই ঘরখানি। আগে ছিল স্কুলের ঝাড়ুদারনীর ঘর। এখন সেই ছোট্টো ঘরখানার মধ্যে পাতা হয়েছে একখানা টেবিল, দুপাশে দুখানা চেয়ার। টেবিল-খানাকে দিয়ে অলিখিত আইনে তাঁরা ঘরখানাকে হিন্দুস্থান পাকিস্থানে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন; একদিকে থাকে ঘটি, আর একদিকে থাকে বদনা। নিজের ঘটিটাকে নিয়ে তিনি বার হলেন ঘর থেকে। বহুকাল তিনি আর মৌলবীসাহেব এক সঙ্গে কাজ করেছেন জেলাস্কুলে। কিন্তু তাঁর পা-দোলান এত খারাপ এর আগে আর কখনও লাগেনি। ক্লাসে গিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলানো তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হেড-মাস্টার মশায়রা বলে বলে হার মেনে গিয়েছিলেন; মৌলবীসাহেব তাঁদের ধমক পর্যন্ত গায়ে মাখতেন না। এমন একটা খোশমেজাজী লোক হঠাৎ তাঁকে বকধার্মিক বললেন কেন? নিজের জানতে তিনি তো মিথ্যাচার কখনও করেন না। টোলে পড়বার সময় কিশোর বয়সে একবার কৃচ্ছ্রসাধনার বাতিক জেগেছিল। তাঁর জীবন-যাত্রায় আজও তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় তাঁর খ্যাতি। তিনি নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন, কলকাত্তাবালী কালীর চরণে জবাপুষ্প-দেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কামরূপ কামাখ্যায়ও তিনি সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সদাচারের মধ্যে কোথাও তো একটুও ফাঁকি নেই! তিনি যা নন তা' দেখাতে তো কোনদিন চেষ্টা করেননি! তবে কেন মৌলবীসাহেব তাঁকে বকধার্মিক ভাবলেন? টোলে পড়বার সময় সেখানকার পণ্ডিত মশাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন "তুরন্ত, তুমি ব্যাকরণ পড়। কাব্য পড়ে কি হবে? বড় মনকে চঞ্চল করে ও জিনিস। বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা

লতা। ইন্দ্রিয়াসক্তির অবলম্বনেই কাব্যের রস জীবিত থাকে।" সেই জন্য গুরুর আদেশে, লঘু চাপল্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পণ্ডিতজী মেরুদণ্ডহীন কাব্যের বদলে ব্যাকরণ পড়েছিলেন। ব্যাকরণের বিধানগুলোর মতনই আষ্টেপৃষ্ঠে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। তার মধ্যে বিচ্যুতি নেই। তবে কেন মৌলবীসাহেব অমন কথাটা বললেন? না না, ওটা একটা নির্দোষ রসিকতা—কিছু না ভেবে বলা—ঠাট্টা করে কথার পৃষ্ঠে বলা কথা মাত্র। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ও বিশেষণটা কখনই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আর সেই মুমূর্ষুর উক্তির যে শব্দটি দু'মাস থেকে তাঁর মনে কির কির করে বিঁধছে, সেটা একটা সর্বনাম; তার উপর বহুবচন। দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই, কোন সম্পর্ক নেই। শব্দটা হচ্ছে "ওরা"। বাক্যটি হচ্ছে "ওরা কি ওই চায়!" এই 'ওরা' শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল। সঃ তৌ তে—ওরার অর্থ তে।......

হঠাৎ নজরে পড়ল হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি আসছেন। চোখ নামিয়ে নিলেন; চোখোচোখি হয়ে গেলে অপ্রস্তুত হতে হ'ত। হেডমিস্ট্রেস যখন আসছেন, তখন টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে নিশ্চয়। নিজেদের বসবার ঘরে পৌঁছে তবে মাটি থেকে চোখ তুললেন উপরে পণ্ডিতজী। অকূল সমুদ্রের মধ্যে নির্বিঘ্ন দ্বীপ এই ঘরখানি। টেবিলের উপর পাজোড়া নড়ছে। মৌলবীসাহেবের প্রায় সারাদিনই ছুটি, কেন না সব ক্লাসে উর্দু পড়বার মেয়ে নেই। সংস্কৃতের ছাত্রী এ স্কুলে কম নয়। পণ্ডিতজী নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, অভিভাবকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্রী জুটিয়েছেন; নইলে মেয়েরা আবার আজকাল অন্য সব ফাঁকির বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কি করে, নৈতিক অনুশাসন আসবে কোথা থেকে,—একথা কেউ বুঝবে না!

মৌলবীসাহেবের কিন্তু ছাত্রী জুটলো কি না, সেসব বিষয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই।

তাঁর সঙ্গে কোন কথা না বলে ক্লাসে যাওয়া দেখায় খারাপ ; ভেবে নিতে পারেন যে 'বকধার্মিক' বলবার জন্য চটেছেন তিনি। তাই পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—"ও মৌলবীসাহেব, ক্লাস নেই নাকি ?"

মৌলবীসাহেব চোখবুঁজেই উত্তর দিলেন—"আমার আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডে কোনদিন ক্লাস থাকে নাকি ?"

"বেশ আছেন মৌলবীসাহেব।"

"যে যেমন নসিব নিয়ে এসেছে।"

"আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলান ; আমি ক্লাস ঠেঙ্গিয়ে আসি।"

নিজের অতর্কিতে তিনি আজ মৌলবীসাহেবের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করছেন বারবার। কিন্তু যাঁকে বলা তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

"আরে ভাই, যে ক'টা টাকা মাইনে দেয়, তার বদলে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে পা-দোলানর মেহনতই যথেষ্ট।"

পাটকরা চাদরখান পণ্ডিতজী কাঁধের উপর সাজিয়ে নিলেন। পাকা গোঁফ-জোড়ার উপর হাতের উলটো পিঠটা বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে সব। হঠাৎ খটকা লাগল মনে—ছেলেদের স্কুলে চাকরি করবার সময়ও কি ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে, চাদর ও গোঁফের বিন্যাস সম্বন্ধে এত সজাগ থাকতেন ? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটা বিষয় না স্বীকার করে উপায় নেই ; চিরকাল তিনি নিজের জামাকাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিতেন ; ইদানীং ধোপার বাড়িতে দেন। তবে এসবগুলো ঠিক প্রসাধনকর্ম নয়। দাঁত খুঁটে হাত ধোবার মত, খেয়ে কুলকুচা করবার মত নির্দোষ অভ্যাস।...

ঘণ্টা পড়ল। পণ্ডিতজী ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর অসাক্ষাতে সবাই তাঁকে তুরন্ত পণ্ডিত বলে ডাকে। কিন্তু তিনি নিজের নাম দস্তখত করবার সময় লেখেন—তুরন্তলাল মিশ্র, ব্যাকরণতীর্থ। বাড়ির চিঠিতে পর্যন্ত। ব্যাকরণ যেমন তাঁর অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছে, ব্যাকরণতীর্থ পদবীটাও তেমনি তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

প্রতি মাসে একবার করে আগে থেকে কোন সূচনা না দিয়ে, পুরনো পড়ার পরীক্ষা নেন পণ্ডিতজী। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে আজ এই ক্লাসের ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবেন।

...এই ক্লাসের মেয়েরা সব চেয়ে বেশী বকুনি খায় হেডমিস্ট্রেসের কাছে, সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করে বলে। ··মহান-শব্দঃ মহাঙ্শব্দঃ···। ছেলেদের দুষ্টু বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের দুষ্টু বলতে বাধে। অবাধ্য কথাটাও ঠিক হয় না। হ্যাঁ, একটু চঞ্চল বেশী।···নৃত্যান-চকোরঃ—নৃতাংশ্চকোরঃ···। কোন ক্লাসের শান্ত অশান্ত হওয়া নির্ভর করে সেই ক্লাসের লীডারদের সাহসের দৌড় কতদূর, তারই উপর। কিন্তু তিনি চিরকাল লক্ষ্য করে আসছেন যে, সব ক্লাসের ছাত্ররাই সংস্কৃত পণ্ডিতের পিছনে লাগতে ভালবাসে। দেবভাষার অনুস্বার বিসর্গ-সম্বলিত উচ্চারণগুলোই ছাত্রছাত্রীদের চোখে সংস্কৃত শিক্ষকদের হেয় করে দেয় কিনা কে জানে! ব্যাকরণের 'ষষ্ঠী চানাদরে' বিধানটি পড়াবার সময় হাসেনি, এমন ক্লাস তিনি দেখেননি। প্রথম যখন চাকরিতে ঢোকেন, তখন ভাবতেন যে ইংরাজী না জানা পণ্ডিত বলেই ছেলেরা তাঁকে উপেক্ষা করে। কতকটা এইজন্য, আর কতকটা ক্লাসে পড়ানর সুবিধার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরাজী শিখেছিলেন। এর ফল কিন্তু হয়েছিল উল্টো; ছাত্ররা আরও বেশী করে তাঁর পিছনে লাগত। কিন্তু সেই সামান্য ইংরাজীর জ্ঞানটুকু তাঁর অতি গর্বের জিনিস। সুবিধা

পেলেই ক্লাসে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না যে তিনি ইংরাজী জানেন।...

এই ক্লাসের লীডার মালবিকা। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তার প্রতিটি কথা থেকে ঠিকরে পড়ে; কিন্তু প্রগল্ভতা যেন আর একটু কম হলেই ভাল হত! ক্লাসের সজীব গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে।...

একটি মেয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখেই ক্লাসে খবর দিল—'তুরন্ত পণ্ডিত আসছে রে!' তিনি ক্লাসে ঢুকলেন হন হন করে—যেন এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে চান না। ছাত্রীদের মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি চাপবার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। ছেলেদের স্কুল হলে তিনি বেশ কয়েকটি চপেটাঘাত দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করতেন; কিন্তু মেয়ে-স্কুলে তাঁর সেই চিরাচরিত পদ্ধতি অচল। মেয়েদের গায়ে কি হাত তোলা যায়? মায়ের জাত! দেবীর মত পূজ্যা কুমারীরা। তাঁদের যুগে এই বয়সের মেয়েদের কবে বিয়ে হয়ে যেত।

ক্লাসের উপযুক্ত বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবার জন্য তুরন্ত পণ্ডিত চেঁচিয়ে সুর করে বললেন—"বা-আ-আই ইন্টেলেকট্।" অর্থাৎ মতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কি হয়? খুব সহজ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ; এ শুধু গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন; পরে আস্তে আস্তে শক্ত হবে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রীরা বুঝে গেল, আজ গতিক সুবিধার নয়। অমন হনহন করে ঘরে ঢুকতে দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এতক্ষণে তিনি তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রিত করেছেন [illegible]লির দিকে। ক্লাসের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকে তাকাতে তাঁর মনে কোনরূপ সঙ্কোচ আসে না। মেয়েটি কুরূপা।

"এসব নামতার মত কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ইউ! ইউ বয়! তুমি বলো!"

সারা ক্লাস হেসে ফেটে পড়ল।

…কেন? হঠাৎ এত হাসির কি হ'ল? মালবিকাই নিশ্চয় আরম্ভ করেছে। ওঃ! অভ্যাসবশে ভুলে 'ইউ বয়' বলে ফেলেছেন! এরকম ভুল তাঁর হয় মাঝে মাঝে। আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে, সকাল থেকে। আর বুঝি ক্লাসকে শাসনে রাখা যাবে না আজ! নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই পণ্ডিতজী চোখ নামিয়ে নিলেন। মালবিকার মুখে কৌতুকের হাসি।

"একটা কথা বলি পণ্ডিতজী, কিছু মনে করবেন না। আপনার পইতাটা কানে জড়ান রয়েছে।"

…ছি, ছি, ছি! (পশ্যন-চকিতঃ—পশ্যংশ্চকিতঃ)…লজ্জায় পণ্ডিতজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পইতাটা জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্য আরও জোরে সুর করে চেঁচালেন—"বা-আ-আই ইন্‌টেলেকট্‌।"

উচ্চ হাসির রোল তাঁর গলার স্বরকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা জিজ্ঞাসা করে—"আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজী?"

অন্যদিকে তাকিয়েই পণ্ডিতজী বললেন—"আবার ব্যাকরণ শব্দটির ভুল উচ্চারণ করছ? প্রতিদিন কি একবার করে বলে দিতে হবে?"

উপরের ক্লাসগুলোর সব মেয়েই বাঙালী। অবাঙালীদের আগেই বিয়ে হয়ে যায় বলে, তারা আর অতদূর পৌঁছতে পারে না। বড় ভাল লাগে পণ্ডিতজীর, এইসব বাঙ্গালী মেয়েদের। ওরা হাসতে জানে; ওদের কথার ধ্বনি মৈথিলীর মত মিষ্টি; কিন্তু এক দোষ ওদের—সংস্কৃতভাষার উচ্চারণ মোটেই করতে পারে না। বকতে গেলে, হেসে ফেলবে; কি করে শেখাবে বলো এদের! কিন্তু ওদের মুখের ভুল

উচ্চারণের ধ্বনিটা শুনতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছা করে, অনেকক্ষণ ধরে শোনেন।...(মহতী-ইচ্ছা—মহতীচ্ছা)...। কুক্কুটাণ্ডলোভী বাঙ্গালী পুরুষরা কবে সাহেব হয়ে যেত; শুধু পারেনি এই মেয়েদের জন্য। নিষ্ঠায়, আচার বিচারে পুরুষদের বিচ্যুতিটুকু মেয়েরা পুষিয়ে দিয়েছে বলেই ওদের সমাজটা এখনও টিকে আছে। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর কোনদিন মিটবার নয়। ..

কোন্ কথার কি প্রতিক্রিয়া হয় পণ্ডিতজীর উপর, সেসব ছাত্রীদের মুখস্থ।

"কেমন ভাবে ব্যাকরণ উচ্চারণ করব পণ্ডিতজী ?"

মালবিকার পাতা ফাঁদে ঠিক পা দিলেন তিনি।

"বলো—বিয়াকরণ, বিয়াকরণ।"

"বিয়া-করণ, বিয়া-করণ"—বিয়া আর করণ শব্দ দুটিকে ভেঙ্গে আলাদা করে বলছে সে। ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসছে। সকলেই নিশ্চিন্ত যে পণ্ডিতজীর পরীক্ষা নেবার ঝাঁজ আজকের মত কমিয়ে দিয়েছে মালবিকা।

"আবার বলো! ত্রিশবার বলো!"

...এই চটুলা মেয়েটিকে শাসনে রাখা শক্ত। কিন্তু মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল।...মাস দুয়েক আগের সেইদিনকার কথা তিনি ভোলেননি। তখন তাঁর মাথায় অত বড় বিপদ। ছোট শালা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল এখানে বেড়াতে। সৌখীন মানুষ; দিনে তিনবার চা না হলে চলে না। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ষ্টোভ। কে বোঝাতে যাবে এই সব ছেলে-ছোকরাদের যে, বাপদাদারা এতকাল যা করে এসেছে তাই করাই ভাল। হ'লও কি তাই! ষ্টোভ ধরাতে গিয়ে শালাজের শাড়ীতে আগুন লেগে যায়। ভীষণভাবে পুড়ে যান তিনি। জামা-কাপড়ে আগুন লেগেছিল কিনা, তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে বেগুন পোড়ার মত পুড়ে

থসথসে হয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য! সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! এখনও মনে করলে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, মুখখানি একটুও পোড়েনি! গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে, কে বলবে যে তিনি পুড়ে গিয়েছেন। প্রথম একদিন তো অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে তাঁর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না, যেতে পারলে যেন বাঁচেন।...সেই সময় বোঝা গিয়েছিল, মালবিকা মেয়েটি কত ভাল। এত প্রগল্‌ভতা সত্ত্বেও কত কোমল ওর হৃদয়। সে এসে বলেছিল—'পণ্ডিতজী, সীতাকুণ্ডের সন্ন্যাসীর দেওয়া একটা পোড়ার ওষুধ মা জানেন, লাগাবেন কি? আস্ত ডাব পুড়িয়ে তয়ের করতে হয়। খুব ভাল ওষুধ; পোড়ার দাগ একেবারে থাকে না।'

তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁর শালার অ্যালোপ্যাথিক ছাড়া আর অন্য কোন ওষুধে বিশ্বাস নেই। মালবিকাকে সেকথা বললেন। তবু সে পরদিন ওষুধ নিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। কোথা থেকে ডাব জোগাড় করেছে, কখনই বা মাকে দিয়ে ওষুধ তৈরী করিয়েছে, সে-ই জানে। কিন্তু সে ওষুধ ব্যবহার করা হয়নি—আজও কৌটায় অমনি পড়ে আছে। ব্যবহার করলে কি হ'ত কে জানে! তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসে এত বড় অঘটন ঘটেছিল, তাই নিজেকে আজও দোষী দোষী মনে হয়; খানিকটা দায়িত্ব ছিল বৈকি। তাঁর ছোট-শালার মুখের দিকে তাকান আর যেত না, শালাজ স্বর্গে যাবার পর। অনেক মৃতপত্নীক দেখেছেন, কিন্তু অত মুষড়ে ভেঙ্গে পড়তে আর কাউকে দেখেননি। ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল! বড় অনুরাগ ছিল দুজনকার মধ্যে; সচরাচর দেখা যায় না অমন। এত অনুরাগ, তবু কেন স্বামীর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা ছিল সেই পতিব্রতার?...

"হয়ে গেল ত্রিশ বার? গুড্‌। Expound সমাস—অর্ধদগ্ধ-শরীরঃ।"

"অর্ধদগ্ধং শরীরং যস্য সঃ—বহুব্রীহি।"

"গুড্। কিন্তু অর্ধদগ্ধটুকু যে বাকি থেকে গেল।"

"অর্ধং যথা তথা দগ্ধম্—সুপ-সুপেতি সমাস।"

"গুড্। কিন্তু চংড়ী মছলি খাওয়া বাঙ্গালীরা দন্ত্য স উচ্চারণ করতে পারে না। শমাশ নয়, বলো সমাস। দন্ত্য স দিয়ে।"

"ওতো পণ্ডিতজী সামাসা হয়ে যাচ্ছে।"

"ওই ঠিক উচ্চারণ। ওই বলো দশবার!"

...কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখের আধো-আধো বুলি যে রকম ভাল লাগে, সেই রকমই ভাল লাগছে এই মেয়েটির শুধু উচ্চারণ ক'রবার ব্যর্থ চেষ্টার ধ্বনি। সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মত এর মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

...মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ—মধুরাঝঙ্কারাঃ।...

"হ'ল দশবার? সিট্ ডাউন! এবার গৌরী তুমি বলো। expound সমাস—মৃতপত্নীকঃ। ভেবে বলো, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। ভয় কিসের?......আশ্‌ন-কতে। আশঙ্কতে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে। গুড্। সিট ডাউন। নেক্সট্। গীতা। গীতা নম্বর এক, তুমি বলো। আজকাল গীতা নামটা এত বেশী কেন তোমাদের মধ্যে? কিন্তু নামটি বেশ ভাল। ওরকম গ্রন্থ আর নেই পৃথিবীতে।"

...স্ত্রীর অনুরোধে, তিনি শালাজের মৃত্যুশয্যার পাশে গীতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন শেষ সময়। যাঁকে শোনান, তাঁর তখন শোনবার বা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। আগের দিনও শালাজ কথা বলেছেন; জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। যে কথাটি তাঁকে গত দু' মাস থেকে পীড়া দিচ্ছে সেটা তো তার আগের দিনই বলা।...তাঁর স্ত্রী ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তখন শালাজের গায়ে। পুরুষ মানুষদের সে ঘরে যাবার উপায় ছিল না। তিনি পাশের ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তারবাবু কোন ভরসা দেননি রোগিণী সম্বন্ধে। ননদ কত কি বলে চলেছেন...'খুব কষ্ট হচ্ছে? ওষুধ দিতে লাগছে? ভাবনা কি, সেরে যাবে দিন-কয়েকের মধ্যে। না, আবার কিসের? সারবে না! কত লোকের কত শক্ত শক্ত রোগ সেরে যাচ্ছে, আর তোমার এই ঘা-ফোস্কাটুকু সারবে না!'...

..'না না আমার আর বেঁচে দরকার নেই'...'ছি, ওকথা বলতে নেই।'...'আমার মরে যাওয়াই ভাল।'...'কি যে বলো। কেন, হয়েছে কি তোমার?'...এর পরের কতকগুলি কথা তিনি মাঝের বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে বুঝতে পারেননি। একটু পরে আবার কানে এল...'না না সে সব ভেবো না তুমি। সর্বাঙ্গ পুড়েছে তোমার কোথায়? দেখ দিকিনি, এই ব্যাথা বিষের মধ্যেও তোমার মুখখানি কি সুন্দর দেখাচ্ছে!'...'ওরা কি ওই চায়'...যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটিও তাঁর কানে এল। অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছে হৃদয় নিঙড়ানো কথা কয়টি। এই বাক্যটিই তাঁকে অস্থির করে তুলেছে গত দুইমাস থেকে। কথাটিকে মোটেই লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাণিনির সূত্রের মতই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। বহু টীকা ভাষ্য করেও আজও বোঝা গেল না, ঠিক কি মনে করে মহিলাটি ওই ওরা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।...

"পণ্ডিতজী, আমিও কি সমাসের উচ্চারণ অভ্যাস করব নাকি?"

"ও, তুমি। নো। তুমি বলো সন্ধি—তদ-ছবিঃ—কি হয়? তচ্ছবিঃ। গুড্। সখী-উক্তম—সখ্যুক্তম। গুড্। বাণী-ঔচিত্যম্। ঠিক হচ্ছে। বলো। হ্যাঁ। বাণ্যৌচিত্যম্। গুড্। সিট্ ডাউন। কিন্তু মূর্ধন্য ণএর উচ্চারণ হ'ল না। তোমরা যে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণএর একই উচ্চারণ কর। আচ্ছা এবার বাণী উঠবে। বাণী তোমার নামের উচ্চারণ কর। সংস্কৃত উচ্চারণ। বাংলা নয়। যে নামের উচ্চারণ করতে পার না, সে নাম রেখে লাভ কি? দশবার বলো।"

এই চেষ্টায়, হাসির ধূম পড়ে গেল ক্লাসে। হেডমিস্ট্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে, একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। পণ্ডিতজীর ক্লাসের সময় এ তাঁর ডিউটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। অপ্রতিভ পণ্ডিতজী কথার খেই হারিয়ে ফেললেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

...মালবিকা আসছে। কেন তা তিনি জানেন। ফাঁকি দিতে পারলে ও ছাড়ে না; কিন্তু কি বুদ্ধিমতী!...ও গন্ধতেল মাখে। পায়ের নখ কাটে না কেন?...সে এসে টেবিলের উপর থেকে বাইরে যাবার 'পাস'টা নিয়ে গেল। ছেলেদের স্কুলে এ ব্যবস্থা ছিল না। এ স্কুলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাসে 'পাস'এর ব্যবস্থা নেই। এ তিনি নিজে করেছেন, নিজের ক্লাসের জন্য। পকেটে করে নিয়ে যান প্রতি ক্লাসে। প্রথমে গিয়েই টেবিলের উপর রেখে দেন, যা'তে মেয়েদের বাইরে যাবার সময় মুখ ফুটে কথাটা বলতে না হয়। শোভন অশোভন সম্বন্ধে এত সজাগ কেন তিনি মেয়েদের বেলায়? এত নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার প্রয়াস কেন? এসব মেয়েরা তাঁর নাতনীর বয়সী; তবু কেন তিনি এদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারেন না? ছেলেদের স্কুলের সেই নিঃসংকোচ ভাব এখানে আসে না কেন?... ক্লাসে এর পরে কি প্রশ্ন করবেন, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হেড্ মিস্ট্রেস একবার ক্লাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চলে যাবার পর এমনিই হয়।.. স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ—দ্বন্দ্ব সমাস নিপাতনে সিদ্ধ—তাঁর বড় পছন্দসই প্রশ্ন, ছেলেদের স্কুলে থাকা কালের। নির্দোষ শব্দটি, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করতে বাধল। আবার খটকা লাগল মনে—আচ্ছা, বাঙ্গালী ছেলেদের মুখের ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত বলা, তাঁর কানে কি এত মিষ্টি লাগত?...মনে পড়েছে আর একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ছেলেদের ক্লাসে পড়াবার সময় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয় বলো। বিম্বোষ্ঠী

ও বিম্বোষ্ঠা দুইই হয়, এই উত্তর তিনি আশা করতেন। কিন্তু এ প্রশ্নটি যে মেয়েদের ক্লাসের অনুপযোগী। এ সব শব্দ ব্যবহার না করেও যদি পারা যায়, তবে দরকার কি! কে কোন্ মানেতে নেবে কে জানে। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবাদের মত, তাঁকেও যে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়; কে আবার কি কোথা থেকে ব'লে দেবে।... আচ্ছা ব্যাকরণের অমোঘ বিধানগুলি তো স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ। তবে তাঁর পড়ানর উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে কেন? মেয়েদের বেলা একরকম, ছেলেদের বেলা আর একরকম হয়ে যান কেন তিনি?... দুজনের মনের ভাবই যে আলাদা। আদর্শ ছাত্র শিক্ষককে গুরু বলে ভক্তি করে—সেটা ভয়ের সম্বন্ধ; ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীদের দিদি বলে—সেটা ভালবাসার সম্বন্ধ।...কারণটা ঠিক মনের মত হ'ল না।...

"লিলি! কাম্ টু দি বোর্ড।"

যখনই দিশেহারা পণ্ডিতজীর মুখে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবার মত প্রশ্ন জোগায় না, তখনই তিনি লিলিকে ডাকেন। এই রুগ্না কুরূপা মেয়েটিই তাঁর খেই-হারানো নিবারণের ওষুধ।

"লেখো, ওরা শব্দের সংস্কৃত কি। এর মধ্যে আবার ভাবছ কি?"

"আমি ভাবছিলাম যে আপনি সমাস না হয় সন্ধি জিজ্ঞাসা করবেন।"

"বাঃ, বেশ জবাব। তাই শব্দরূপ জিজ্ঞাসা করলে পারবে না? তুমি হচ্ছ বিদুষীকল্পা—অর্থাৎ ঈষদূনা বিদুষী। বুঝেছ? সম্ভবত বোঝনি। শব্দরূপ যে জানে না, তার পক্ষে তদ্ধিত বোঝা কঠিন। ব্যাড্। গো টু ইয়োর সিট্।"

অযথা দরকারের চেয়েও চটে উঠেছেন পণ্ডিতজী। লিলির হাত থেকে খড়ি আর ঝাড়ন তিনি টেনে নিলেন। অন্য কোন মেয়ে হলে তিনি অপেক্ষা করতেন তার খড়ি আর ঝাড়ন যথাস্থানে রাখবার; তারপর নিতেন।

এতক্ষণে নজরে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর আগে থেকেই লেখা আছে—"বিয়াকরণ শব্দটি দিয়া একটি বাক্য রচনা কর। উত্তর: মৌলবী সাহেবের ন্যায় পুনরায় বৃদ্ধবয়সে শ্রীতাড়াতাড়িলাল মিশ্র, বিয়াকরণতীর্থে যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। গুড্। সিট ডাউন।"

মৈথিলী আর বাংলার লিপি একই। সেইজন্য পণ্ডিতজীর বাংলা পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। তুরন্ত শব্দটির হিন্দীতে অর্থ তাড়াতাড়ি। তাই তুরন্তলাল নামটা চিরকাল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের হাসির খোরাক জুটিয়ে এসেছে। চটুলা মালবিকা একদিন তাঁকে তুরন্তলাল নামটার মানে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল। দুষ্টু ছেলেরাতো চিরকাল বাইরে যাবার ছুটি নেবার সময় বলত—তুরন্ত ফিরে আসবো পণ্ডিতজী। শুনে ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসত, আর তিনি বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার দিতেন তাদের। কিন্তু তিনি এখানে মনে মনে হাসেন ছাত্রীদের এই সমস্ত রসিকতায়। বাঙ্গালী মেয়েদের সূক্ষ্ম মনের অন্ধিসন্ধিগুলোর সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা নেই। বোর্ডের লেখাটি নিশ্চয়ই মালবিকার; হ্রস্ব ইকারটা রেফের মত করে লেখা। সেই জন্যই ক্লাস থেকে পালিয়েছে। শব্দবিন্যাসে কিন্তু বেশ রসনিপুণতা আছে। সারা ক্লাস থেকে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে আসছে। মেয়েরা জানে যে হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে ভয়ে, পণ্ডিতজী কোন দিন নালিশ করতে যাবেন না তাঁর কাছে। তাই তাদের এত সাহস। মেয়েরা যে সব বোঝে। তারা যে সব সময় বলাবলি করে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় পণ্ডিতজী অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে চোখ বুঁজে আড়ষ্ট হয়ে, কেমন করে বসেছিলেন। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে, ক্লাসের ছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এ নিয়ে যে তারা কত সময় হাসি ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতজী ঝাড়ন দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করে নিয়ে লিখলেন—সঃ তৌ তে। "তে বহুবচন, তে মানে ওরা। তে শব্দটির সঙ্গে ইংরাজী they শব্দটির কি রকম মিল লক্ষ্য করেছ লিলি?" তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ করেই বলছেন। 'তে'র জায়গায় গিয়ে খড়ি সুদ্ধ হাত থেমে গিয়েছে।...সেই সতীসাধ্বী মরবার আগের উক্তিতে বহুবচন ব্যবহার করলেন কেন? 'ওরা কি ওই চায়'। 'ওরা' বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন? নিজের স্বামীর কথাই কি তিনি তখন ভাবছিলেন? 'ওরা' বলতে সমগ্র পুরুষ জাতিকে তিনি বোঝেননি তো? তা' কি করে হবে। ওরূপ সামান্যীকরণ যে ভুল, সে কথা নিশ্চয়ই তাঁর শালাজও জানতেন। তাঁর জানা শোনা আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই কত নিষ্ঠাবান সংযমী পণ্ডিত তিনি দেখেছিলেন। সকলে সে রকম হতে যাবে কেন! স্বামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্যের তীব্রতা বয়স্থা ননদের সম্মুখে কমাবার জন্যই কি তিনি অনিচ্ছায় একবচনের বদলে বহুবচন ব্যবহার করেছিলেন? নিজের স্বামীর সম্বন্ধেই বা ওরকম ধারণা হল কেন সে পতিব্রতার? কি ভেবে সে মহিলা 'ওরা' বলেছিলেন তিনিই জানেন। দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।...আচ্ছা এই ক্লাসের ছাত্রীরা তাঁকে আর মৌলবী সাহেবকে একই শ্রেণীর লোক বলে ভাবে নাকি? ব্ল্যাক বোর্ডের উপরকার লেখাটা দেখে তো তাই মনে হয়? কেন এরকম ভাবে?...কি দেখে তাঁকেও ওই দলে ফেলল?...

স্কুলের দাই চিঠি নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। খামে চিঠি এসেছে পণ্ডিতজীর। ডাক পিয়ন হেড মিস্ট্রেসের কাছে স্কুলের ডাক দিয়ে যায়, তিনি তারপর যার যার চিঠি তার তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দাই-এর হাত থেকে চিঠিখানা নেবার সময়, খুব সাবধানে নিলেন পণ্ডিতজী, যাতে দাই-এর আঙুলের সঙ্গে তাঁর আঙুল না ঠেকে। এ সব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সদা জাগ্রত। কিন্তু আজ প্রথম খটকা লাগল

মনে। প্রশ্ন করলেন নিজেকে—পরস্ত্রীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার জন্য এই এত শুচিবাই কেন?…কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?

পণ্ডিতজী চিঠিখানা খুললেন। বড় শালা লিখেছেন তাঁর দিদিকে। এদেশে স্ত্রীর চিঠি স্বামীর নামেই আসে, তাই খামের উপর তাঁর নাম ছিল। ছোট শালার বিয়ে এক সপ্তাহ পরে; তাই বোন আর ভগ্নীপতিকে যেতে লিখেছেন। ছোট শালা কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হচ্ছিল না; অতি কষ্টে ধরে-বেঁধে রাজী করান গিয়েছে।

চিঠি পড়েই কি জানি কেন পণ্ডিতজীর মেজাজ বিগড়ে গেল ছোট শালার উপর।…দুই মাসও কাটেনি! সবুর সইছে না! আর কিছুদিন পর করলেই তবু কতকটা শোভন হ'ত!…

"লিলি, বুঝেছ—তে হচ্ছে বহুবচন। সাধারণত অনেক লোককে বোঝায়। কিন্তু বলতো একজন লোকের বেলায় কখন বহুবচন ব্যবহার হয়? জান না? নেক্সট্! নেক্সট্! এনি বডি ইন্ দি ক্লাস? কেউ জান না?‥(মালবিকা থাকলে পারত)…। গৌরবে বহুবচন হয় কেউ জান না? স্ত্রীর উক্তিতে পতির সম্বন্ধে উল্লেখের সময়, সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার হতে পারে। বুঝেছ?"

পণ্ডিতজী ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—"গৌরবে বহুবচন।" লেখাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, নিজের বিবেককে আশ্বাস দেবার জন্য। এতক্ষণে তাঁর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাবার সময় হল। নজর পড়ল লিলির দিকে। কাঁদছে তাঁর বকুনি খেয়ে। ছেলেরা বিলক্ষণ প্রহার খেয়েও কাঁদত না; কিন্তু সামান্য কথাতেই মেয়েদের চোখে জল আসে। তিনি এমন কিছু রূঢ় ভৎসনা করেননি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে কেঁদে ভাসাতে হবে!…

"ললিতা, এবার তুমি বলো। সন্ধি। খুব সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তোমাকে। মধু-উৎসবঃ কি হয়? বানান করে বলো। গুড্। হ্যাঁ, দীর্ঘউকার, মনে করে রেখো। সমাস কর—দ্বিতীয়া ভার্যা যস্য সঃ। হ্যাঁ। গুড্। সিট্ ডাউন। নেক্সট্। [illegible]। তুমি ভ্রম সংশোধন কর এই বাক্যটির—ভ্রমরাঃ পুষ্পমধু পিবতুম ধাবন্তি। না। ভেবে বলো। হ'ল না। এনি বডি ইন দি ক্লাস; কেউ পার না?... (মালবিকা এখনও ফেরেনি)!...পিবতুম ভুল। পাতুম হবে। মনে করে রেখো।"

...আজকে মালবিকাকে বেশ করে বকে দিতে হবে। এ কি অন্যায় কথা! গিয়েছে, সে কি এখন! সমস্ত ঘণ্টাটা বাইরে কাটিয়ে সে আসবে! প্রতিদিন সে এই করে! নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়েছে! এতটুকু আক্কেল নেই—অন্য মেয়েদেরও তো ঐ পাসখানা নেবার দরকার হ'তে পারে!...

মেয়েরা সকলেই জানে যে পণ্ডিতজীর সব চেয়ে কড়া ধমক হচ্ছে 'ব্যাড্' শব্দটি।

মালবিকা এসে ক্লাসে ঢুকল। তার মানে ঘণ্টা শেষ হবার আর দুচার মিনিট মাত্র দেরি আছে। পাসখানা পণ্ডিতজীর টেবিলের উপর রাখবার জন্য সে এগিয়ে আসছে। তেলের গন্ধটা নাকে এল।

...শোভনঃ—গন্ধ শোভনোগন্ধ। পায়ের আঙুলের নখ কাটে না কেন?...

"অনেক দেরি হ'ল তোমার।"

"আমি তো পণ্ডিতজী পরীক্ষা দিয়ে, বিয়াকরণ আর সামাসার উচ্চারণ শিখে, তারপর গিয়েছি।"

...মেয়েটি এমন সব কথা বলবে যে না হেসে উপায় নেই। বড় বড় পাকা গোঁফের মধ্যে হাসিটুকু আটকে গেল। ক্লাসের মেয়েরাও

হাসছে। পণ্ডিতজী হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললেন—"ক্লাস ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসাবে তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।"

"উচ্চারণের পরীক্ষা নাকি পণ্ডিতজী?"

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বলেন—"না না। তুমি বলতো বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়?"

এত সহজ প্রশ্ন? মালবিকার মত ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া মেয়েকে? ক্লাসের মেয়েরা একটু অবাক হল।

"বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা দুইই হয়।"

এতক্ষণে পণ্ডিতজী নিজেকে সামলে নিলেন। গুড সিটডাউন, বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। মালবিকা ফিরে আসবার এক মুহূর্ত আগেই যে উনি ঠিক করেছিলেন, আসামাত্র আগেই ওকে কড়া ধমক দিতে হবে—ব্যাড্ বলতে হবে! মুহূর্তের অসংযতচিত্ততায় তিনি ব্যাড্ বলতে ভুলে গিয়েছেন! শুধু তাই নয়। আজ প্রথম এই স্কুলে বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা কি তাঁর এই বিচ্যুতির কথা ধরতে পেরেছে? আতঙ্ক, বিষাদ, আর অনুশোচনার ছায়া পড়ল তাঁর মনে। মনের কুহেলীর মধ্যে শুধু একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। 'ওরা' শব্দের অর্থ। ভদ্রমহিলা কাউকে বাদ দেননি। পক্ককেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পর্যন্ত না। অদ্ভুত অর্থবোধিকা শক্তি কথা কয়টির। বৃথাই তিনি গত দুই মাস থেকে একটি অলঘু বিষয়কে লঘু করবার চেষ্টা করছিলেন, গৌরবে-বহুবচন সূত্র দিয়ে। বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিলেন না।

ঝাড়নখানাকে নিয়ে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা 'গৌরবে বহুবচন' কথা কয়টি মুছে দিলেন। মনের মধ্যে এতদিনকার পোষা আত্ম-গৌরবটুকুও মুছে গেল এরই সঙ্গে।

"এসব তোমাদের দরকার নেই, বুঝলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব প্রশ্ন কখনও আসে না।"

ঘণ্টা পড়ল ক্লাস শেষ হবার।

খড়ির গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার ছলে, নিজের হাতের আঙুল-গুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাকরণের সমস্যাটা মিটেছে; কিন্তু অঙ্কর উত্তর মিলে যাবার পরিতৃপ্তি নেই এর মধ্যে। নিজের উপর অপ্রসন্নতায় সব কিছু খারাপ লাগছে। সবাই সমান—তিনি, মৌলবীসাহেব, ছোটশালা,—সবাই! ...গতৌ ঔৎসুক্যম—গতাবৌৎসুক্যম...। শোভন আচরণের পথ দিয়ে তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে বিশ্রামঘরের দিকে চলেছেন।...আকৃষ—তঃ আকৃষ্টঃ...। সহস্রজোড়া কুতূহলী চোখ নিশ্চয়ই তাঁকে লক্ষ্য করছে,—চিনে গিয়েছে সবাই তাঁকে—বিবস্ত্র, নগ্ন তিনি আজ—লজ্জার ভারে ঝুঁকে পড়েছেন—ঘরে ঢুকবার আগে চৌকাঠে হোঁচট খেলেন।

টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে, অবিরাম গতিতে। এর জ্বালায় টেবিলের উপর একখানা বই পর্যন্ত রাখবার জো নেই!—পুস্তক হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতী! এই বকধার্মিকবলা লোকটা যদি চোখ-দুটোও খুলে রাখত পা দোলানর সময়, তা'হলে আর তাঁর কানে পইতা জড়ানো অবস্থায় ক্লাসে যেতে হ'ত না আজ!

"ও মৌলবীসাহেব, ঘুমিয়ে নাকি? একটা কথা বলছি—এতদিন বলি বলি করেও বলিনি—কিছু মনে করবেন না। আপনি যদি আবার বিবাহ করেন, তাহলে হেডমিস্ট্রেস আর স্কুল কমিটির মেম্বররা বিরক্ত হবেন।"

মৌলবীসাহেব চোখ বোঁজা অবস্থাতেই ছড়া আওড়ালেন—"জো গুল কি জোহিয়া হ্যায়, উসে কেয়া খার কা খট্‌কা? যে গোলাপ তুলতে চায় তার কি কখনও কাঁটার ভয় করলে চলে?"

……বলা বৃথা লোকটাকে! …অলঘুম্ লঘুম্ করোতি—লঘূ-করোতি। ঘ-এ দীর্ঘউ হবে, বুঝলে মালবিকা।…আচ্ছা, আজকের চিঠিখানির কথা স্ত্রীর কাছে চেপে গেলে কেমন হয়? পোষ্ট অফিসে কত চিঠিইতো হারিয়ে যায়। তাহ'লে তাঁকে আর যেতে হয় না ছোট-শালার বিয়েতে!…কিন্তু, মেয়েমানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ! তারা যে সব ধরে ফেলে! তারা যে পুরুষদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়!…কোন উপায় নেই!…তবু তিনি চেষ্টা করে দেখবেন আজ।—আজ প্রথম জেনেশুনে মিথ্যাচার করবেন।…কিন্তু সত্যিই কি বকধার্মিকের এই প্রথম মিথ্যাচার?

ডাকাতের মা

আগে সে ছিল ডাকাতের বউ। সৌখীর বাপ মরে যাবার পর থেকে তার পরিচয় ডাকাতের মা বলে।...ডাকাতের মায়ের ঘুম কি পাতলা না হলে চলে! রাতবিরাতে কখন দরজায় টোকা পড়বে তার কি ঠিক আছে! টক্ টক্ করে দু টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোকে টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরও একবার হলে বুঝতে হবে যে, সৌখী নিজে বাড়ী ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম—"তখনই দরজা খুলবি না হুট করে! খবরদার! দশবার নিশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর দরজা খুলবি।"...আরও কত রকমের টোকা মারবার রকমফের আছে। কতবার হয়েছে, কতবার বদলেছে। দুনিয়ায় বিশ্বাস করবে কা'কে; পুলিসকে ঠেকানো যায়; কিন্তু দলের কারও মনে যখন পাপ ঢোকে তখন তাকে ঠেকানো হয় মুশকিল। দিনকালই পড়েছে অন্যরকম! সৌখীর বাপের মুখে শোনা যে, সেকালে দলের কে যেন জখম হয়ে ধরা পড়বার পর, নিজের হাতে নিজের জিব কেটে ফেলেছিল—পাছে পুলিসের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে সেই

ভয়ে। আর আজকাল দেখ! সৌখী জেলে গিয়েছে আজ পাঁচ বছর; প্রথম দু বছর দলের লোক মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেত; তিন বছর থেকে আর দেয় না। এ কি কখনও হতে পারত আগেকার কালে? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের পাটই কি একেবারে উঠে গেল দুনিয়া থেকে? সৌখীর বাপ কতবার জেলে গিয়েছে; সৌখীরও তো এর আগে দুবার কয়েদ হয়েছে; কখনও তো দলের লোকে এর আগে এমন ব্যবহার করেনি। মাস না যেতেই হাতে টাকা এসে পৌছেছে—কখনও বা আগাম—তিন চার মাসের এক সঙ্গে। কিন্তু এবার দেখতো কাণ্ড! একটা সংসার পয়সার অভাবে ভেসে গেল কি না তা' একবার উঁকি মেরে দেখল না দলের লোক! আগের বউমার শরীরটা ছিল ভাল। সৌখীর এবারকার বউটা রোগারোগা। তার উপর ছেলে হবার পর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে শরীর। সৌখী যখন এবার ধরা পড়ে, তখন বউমার ছেলে পেটে। হ্যাঁ, নাতিটার বয়স চার পাঁচ বছর হল বইকি। কি কপাল নিয়ে এসেছিল! যার বাপের নামে চৌকিদার সাহেব কাঁপে, দারোগাসাহেব পর্যন্ত যার বাপকে তুইতোকারি করতে সাহস করেন নি কোন দিন, তারই কি না দুবেলা ভাত জোটে না! হায়রে কপাল! এ বউমা যে খাটতে পারে না ঐ রোগা শরীর নিয়ে। আমি বুড়ো মানুষ, কোন রকমে বাড়ী বাড়ী গিয়ে দুটো খই মুড়ি বেচে আসি। তা' দিয়ে নিজের পেট চালানোই শক্ত। সাধে কি আর বউমাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হ'ল! তা' ছাড়া গয়লাবাড়ীর মেয়ে। ঝি চাকরের কাজও তো আমরা করতে পারি না। করলেই বা রাখত কে? সৌখীর মা বউকে কি কেউ বিশ্বাস পায়! নইলে আমার কি ইচ্ছা করে না যে, বউ নাতিকে নিয়ে ঘর করি! বেয়াইয়ের দুটো মোষ আছে। তবু বউ নাতিটার পেটে একটু একটু দুধ পড়ছে। ওদের শরীরে দরকার দুধের। আর বছরখানেক বাদেই তো সৌখী

ছাড়া পাবে। তখন বউকে নিয়ে এসে রূপোর গয়না দিয়ে মুড়ে দেবে। দেখিয়ে দেব পাড়ার লোকদের যে, সৌখীর মায়ের নাতি পথের ভিখিরী নয়। আসতে দাও না সৌখীকে! দলের ওই বদলোকগুলোকেও ঠাণ্ডা করতে হবে! আমি বলি, এসব একলসেঁড়ে লোকদের দলে না নিলেই হয়। ওরা কি ডাকাত নামের যুগ্যি; চোর, ছিঁচকে চোর। ওই যেটা টাকা দিতে আসত, সেটার চেহারা দেখেছ। তালপাতার সেপাই! থুতনির নীচে দু গাছা দাড়ি! কালি-ঝুলই মাখ, আর মশালই হাতে নাও, ওই রোগাপটকাকে দেখে কেউ ভয় পাবে কস্মিনকালে?......

ঘুম আর আসতে চায় না। রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোন কালেই ঘুম হয় না শীতের দিনে।...একবার সৌখী কোথা থেকে যেন রাতদুপুরে ফিরে এসে টোকার সাড়া না পেয়ে, কি মারই মেরেছিল মাকে! বলে দিয়েছিল যে ফের যদি কোনদিন নাকমুখ ঢেকে শুতে দেখি, তাহলে খুন করে ফেলে দেব! বাপের বেটা, তাই মেজাজ অমন কড়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেও একটা বকুনি দেবার লোক পর্যন্ত নেই বাড়িতে, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে! এ কি কম দুঃখের কথা!......

ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে এক দিনের জন্যও নাকমুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে।

...বাইরে নোনা আতা গাছতলায় শুকনো পাতার উপর একটু খড় খড় করে শব্দ হল। গন্ধগোকুল কিম্বা শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়। কি খেতে যে এরা আসে বোঝা দায়...বুড়ো হয়ে শীত বেড়েছে! আগে একখান কম্বলে কেমন দিব্যি চলে যেত। এ কম্বলখানা হয়েওছে

অনেক কালের পুরনো। এর আগেরবার সৌখী জেল থেকে এনেছিল। সে কি আজকের কথা!

কম্বলখানার বয়স ক' বছর হবে তার হিসাব করতে গিয়ে বাধা পড়ে। টক্ টক্ করে টোকা পড়ার মত শব্দ যেন কানে এল। টিকটিকির ডাক বোধ হয়! হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! টিকটিকিটা সুদ্ধ খুনসুড়ি আরম্ভ করেছে, মজা দেখবার জন্য। করে নে।

টক্ টক্ করে আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল।

…না। তা হলে টিকটিকি না তো। আওয়াজটা থনথনে—টিনের কপাটের উপর টোকা মারবার শব্দ!

বুড়ী উঠে বসে। ঘর গরম রাখবার জন্য সে আগুন করেছিল মেঝেতে, সেটা কখন নিভে গিয়েছে; কিন্তু তার ধোঁয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করে তুলেছে।…এতদিনে কি তাহলে দলের হতভাগাগুলোর মনে পড়েছে সৌখীর মায়ের কথা?

আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল। আর সন্দেহ নেই! অনেক দিনের অনভ্যাসের পর এই সামান্য ব্যাপারটা বুড়ীর মনের মধ্যে একটু উত্তেজনা এনেছে।

…তবু বলা যায় না।…কে না কে…

সৌখীর মা আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল।… লোকটাও বোধ হয় কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। বিড়ির গন্ধ নাকে আসছে।…আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার তো কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তাহলে তো লোকটা টাকা দিতে আসে নি! পুলিসের

লোকটোক নয় তো? টোকা মারবার নিয়ম...গুলো হয়তো ভাল জানে না!...সৌখীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরী!...নিশ্চয়ই পুলিসের লোক! তবে তুমি যে-ই হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তার পর অন্য কথা।...কথা বলতে হবে সাবধানে; দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজানতে।...

হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিশ্বাস ফেলবার কথা। মানসিক উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছেই না তা' গুণবে কি!... বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ী তাড়াতাড়ি দশবার নিশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল।

"কে?"

দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছম ছম করে।

"ঘর যে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢুকি কি করে?"

"কে, সৌখী! ওমা তুই! আমি ভাবি কে না কে।"

বুড়ী ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে।...এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একই রকম থেকে গেল! জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা'র সঙ্গে খুনসুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ!...এ আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।...

"লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশী হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশী আর কি! হেড জমাদার সাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সে-ই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলরবাবুর কাছে। তাই বেশী 'রেমিশন' পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তুই কুঁপিটা জ্বালতো আগে। তার পর সব কথা হবে।"

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সোথী যা'তে ঘরের অন্য সকলেও শুনতে পায়। তার পর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য, দেশলাইয়ের কাঠি জেলে তুলে ধরে।

বুড়ী এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক ধরেছে এবার; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগারোগা লাগছে যেন! সোথীটার তো বাপেরই মত জেলে গেলে শরীর ভাল হয়। তবে এবার এমন কেন? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেওয়াল পর্যন্ত কি যেন খুঁজছে। কাদের খুঁজছে সে কথা আর বুড়ীকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না।···

"হ্যাঁ রে জেলে তোর অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি?"

সোথী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না; জিজ্ঞাসা করে "এদের কাউকে দেখছি না?"

প্রতি মুহূর্তে বুড়ী এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল। জানা কথা যে, জিজ্ঞাসা করবেই;··তবু··

"বউ বাপের বাড়ী গিয়েছে।"

"হঠাৎ বাপের-বাড়ী?"

···এতদিন পর বাড়ী ফিরেছে ছেলে। এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে চায় না। মরদের রাগ! শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে.রাগের মাথায় দলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।··· নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথা? এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সোথী। আগের বউটার ছেলেপিলে হয়ইনি! এ বউয়ের ওই একটিইতো টিম টিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সোথী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারবনা? খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে।···

"কেন, মেয়েদের কি মা বাপকে দেখতে ইচ্ছে করে না একবারও ?"

"না না, তা'ই কি বলছি নাকি ?" অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশী সৌখী। তার বাড়ী ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টোকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল রাত ন'টার মধ্যে দুরন্ত ছেলেটা নিশ্চয়ই ঘুমবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে...কালই সে যাবে শ্বশুরবাড়ী বউছেলেকে নিয়ে আসতে। একথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভাল দেখায় না ; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে।...মা কত কি বলে চলেছে ; এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।

"নে, হাতমুখ ধুয়ে নে।"

"না না। আমি খেয়ে এসেছি। এই রাত করে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।"

"না, রাঁধছে কে। খই মুড়ি আছে। খেয়ে নে। তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না !"

ব্যবসার পুঁজি খই মুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মা'র গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে।

"ওখান আমাকে দে।"

আপত্তি ঠেলে সৌখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল।

নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ীর ঘুম আর আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে

উঠেছে। সৌথীর নাকডাকানির একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ী এল ; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে ; তা নয়, সৌথীকে কি খেতে দেবে কাল সকালে, সেই হয়েছে বুড়ীর মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না হয় বিক্রির খইমুড়ি দিয়ে কোন রকমে চলে গেল। ...যদি বলতো দুটো ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তা হলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না বলে।...আলু চচ্চড়ি খেতে কি ভালই বাসে সৌথীটা! কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি। আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা যোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেবো!...

...কাছারীর ঘড়িতে দুটো বাজল।...ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।...

মনে পড়ল যে, পেশকার সাহেবের বাড়ি রাজমিস্ত্রী লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে, পড়েযাওয়া উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে। বুড়ী বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরুল ঘর থেকে।

মাতাদীন পেশকারের বাড়ি বেশী দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর ভাঙ্গা ইটের পাহাড় নীচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ভাঙতে বুড়ীর বিশেষ অসুবিধা হল না। ...বাড়ি নিশুতি!...

অন্ধকারে কি কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোর-গোড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকার সাহেবের খড়মজোড়া, আর জলভরা ঘটি—ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে। ভয়ে বুড়ী উঠানের আর কোথায় কি আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটি তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জলটুকু

পর্যন্ত ফেলেনি।…এখন রাত দুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারকয়েক লোটা না মাজলে মাতাদীন পেশকারের হাত নিশপিশ করে। সেইজন্য হুলস্থুল পড়ে গেল তাঁর বাড়িতে সকালবেলায়।

খোকার মা নাকে কেঁদে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, লোটা হ'ল বাড়ির লক্ষ্মী;…এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে।—"বাজে বক্‌বক্‌ কর না। তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিসকে না দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে ; সে খবর রাখো?"

আইনচঞ্চু মাতাদীন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।

ফিরতিমুখো তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানা রকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া যায় না। পেশকারসাহেব বড় খুঁতখুঁতে লোটা সম্বন্ধে। তিনি চান খুরো দেওয়া লোটা—বুঝলে কিনা—এই এত বড় সাইজের—মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি মোটা রূপোর কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য।… দোকানদার শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"পুরনো হলে চলবে? নামেই পুরনো। সস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।"

"পুরনো বাসনও বিক্রি হয় না কি এখানে? দেখি।"

ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমা জোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন।…খুরোর নীচে ঠিক সেই তারা আঁকা! আর সন্দেহ নেই!…

মাতাদীন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুঁটি চেপে ধরেন।—"বল! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকানদারি—আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে!"

একেবারে হই-হই রই-রই কাণ্ড। দোকানে লোক জড় হয়ে গেল। দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দ আনা পয়সা গুণে, সৌথীর মায়ের কাছ থেকে—এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে।

"চোদ্দ আনায়, এই ঘটি পাওয়া যায়? চোরাইমাল জেনেই কিনেছিস! চোরাইমাল রাখবার ফৌজদারী ধারা জানিস?"

পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন একজন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগা-সাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার শুনে তিনি সদলবলে সৌথীর বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সৌথীর মা আলুর তরকারি চড়িয়েছে উনুনে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন-পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সৌথী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে সে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

দারোগা পুলিস দেখে বুড়ীর বুক কেঁপে ওঠে। পুলিস দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিসকে তাদের বাড়িতে হানা দিতে দেখেছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদীন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিসের সঙ্গে রয়েছে! তার যে ধারণা ছিল, বাসনওয়ালারা পুরনো বাসনগুলোকে রং-চং দিয়ে নতুনের মত না করে নিয়ে বিক্রি করে না…পাঁচ সাত বছর আগে পুলিস একবার ভোররাত্রে তাদের বাড়ি ঘেরাও করেছিল, বন্দুকের খোঁজে। তখন তো মাথা হেঁট হয়নি তার। ডাকাতি করা তার

স্বামী-পুত্রের হকের পেশা। সেতো মরদের কাজ; গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সে ক্ষেত্রে দুরদৃষ্ট মাত্র—তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু এ যে চুরি!···ছিঁচকে চোরের কাজ, শেষকালে······

লজ্জায় সৌথীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে!

দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তাকে—"তুই এই লোটা আজ বাজারের বাসনের দোকানে চোদ্দ আনায় বিক্রি করেছিস?"

কোন জবাব বেরুল না বুড়ীর মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে, সে মাথা হেঁট করে নিল।

এতক্ষণে বোঝে সৌথী ব্যাপারটা। চোদ্দ আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল!···কেন মা তাকে বলল না!··· এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকেদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েছে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার।···বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল।···কিন্তু সে সময় পেল কই? রাতে এসে শুয়েছে; এতক্ষণ তো বিছানা ছেড়ে ওঠেই নি।···শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! জেলের মধ্যে ওই সব ছিঁচকে 'কদু-চোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোন দিন!...ডাকাতরা জেলে আলাপ-সালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, এ কথা তো মায়ের অজানা নয়। · 'কদুচোর'দের যে মাত্র দু-মাস তিন মাসের সাজা হয়!···মা কি জানে না যে··

··"এই বুড়ী! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বল। জবাব দে।"

বুড়ী নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কি না, সে কথা বোঝাও যায় না তার মুখ দেখে।

আর থাকতে পারল না সৌথী।

"দারোগাসাহেব মেয়েমানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাত্রে।"

বিজ্ঞ দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেনে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সৌথীকে ঘুমতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ীর মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

এইবার সৌথীর মা ভেঙ্গে পড়ল।...ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে!...

"না না দারোগাসাহেব! সৌথী করেনি, আমি করেছি। ওকে গ্রেপ্তার করবেন না! আমাকে করুন। ও কিছু জানে না। ও যে ঘুমুচ্ছিল। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর।..."

দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ী।

কিন্তু তিনি বাসনওয়ালা কিম্বা এই বুড়ীটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না; তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সৌথী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।

মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উননে চড়ানো আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিবেকের গণ্ডি

গ্রামের ছেলে। পয়সার জোর নেই; খুঁটির জোর নেই, তবু শহরে ওকালতি করতে এলাম। একমাত্র সম্বল পাড়াগেঁয়ে এক-গুঁয়েমিটুকু। আর দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল মনের যে, যেমন করে হ'ক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কোন জায়গায় উকিল হয়ে বসতে গেলে সেখানকার গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে হয়। সবচেয়ে আগে মনে পড়ল বৃদ্ধ মহেশবাবুর নাম। তাঁর দানধ্যানের খ্যাতি এ জেলার কোণায় কোণায়। বহু গরীব দুঃস্থ ছেলে তাঁর বাড়ীতে থেকে স্কুল-কলেজে পড়ে। গ্রামের যে প্রাইমারী স্কুলে আমি ছেলেবেলায় পড়তাম, সেখানে এঁর ফটো টাঙানো ছিল; তিনি যখন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান তখন ওই স্কুল স্থাপিত হয়। আজকাল বয়স হওয়ায় কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। ভজন-পূজন নিয়েই থাকেন। বাড়ীতে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যখন দেখা করতে গেলাম, তখন তিনি মন্দিরের বারান্দায় বসে গীতা পড়ছেন। কোঁচার খুঁট গায়ে। মিষ্টি কথায় ও ব্যবহারের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম প্রথম আলাপেই।

"নতুন এসেছেন; কোন রকম কিছুর দরকার-টরকার হ'লে বলবেন। লজ্জা করবেন না যেন! উঠেছেন কোথায়? বাসা পেয়েছেন? না হ'লে আমাদের এখানেও থাকতে পারেন।"

গল্প শুনেছিলাম যে মহেশবাবুর নাকি কোন পাওনাদার নেই; আর কেউ নাকি তাঁর ওখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসে না। এখন দেখলাম যে কারও উপকার করতে পারলে তিনি সত্যই কৃতার্থ হয়ে যান।...মনে মনে তাঁর প্রস্তাবটি ভেবে দেখলাম।...

...বই আলমারি, চেয়ার, টেবিল দিয়ে ঘর সাজিয়ে না বসলে মক্কেল আসবে কেন?...এঁর অতিথিশালায় দশজনের মধ্যে থেকে ওকালতি করা সম্ভব নয়।...হ'ত বটে কিছু পয়সা সাশ্রয়, কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই।...

কাজেই বলতে হ'ল "আমি বাসা ঠিক করে ফেলেছি আগেই।"

"বাড়ীর অবস্থা তাহ'লে বেশ ভাল বলুন?"

"না না। মোটেই না। সামান্য কিছু জমি-জমা আছে। আমার মাকে নিয়ে আসতে হবে কিনা, তাই আগেই বাসা ঠিক করেছিলাম।"

"একটু হাল-চাল না দেখে নিয়ে প্রথমেই মাকে আনা কি ঠিক হবে?"

"সে উপায় থাকলে কি আর কথা ছিল!"

"ওকালতির রোজগার দিয়ে প্রথম থেকে সংসার চালানো কি সোজা কথা!"

"সে তো জানিই। রাত্রে ছেলে পড়াব ঠিক করেছি।"

"এই সব ছোট শহরে টুইশানি জোটানোও শক্ত। যাদের আছে সে পয়সা, তারা স্কুলের মাষ্টারদেরই প্রাইভেট টিউটর রাখতে চায়। তাতে একটু পাশটাশের সুবিধা হয়—বুঝলেন না?"

এ কথার আর কি জবাব দেবো। একটু দমে গেলাম। বৃদ্ধ বোধ হয় বুঝলেন আমার মনের ভাব। তাঁর সৌম্য মুখে ফুটে উঠল করুণার রেখা।

"আচ্ছা আমার নাতি নাতনীটিকে একটু পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে পারেন? ইংরাজী পড়াবার জন্য অনেকদিন থেকে আর একজন মাষ্টার মশাই খুঁজছি। পণ্ডিমতশাই তাদের পড়ান সকালে; আপনি রাত্রে যদি পারেন তো দেখুন। ঠিক সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে। সবই লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা!..."

তিনি মন্দিরের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন চোখ বুঁজে। স্পষ্ট বুঝি যে নাতিনাতনীকে পড়ানর উপলক্ষ করে তিনি আমায় অর্থ সাহায্য করতে চান।...

তবু আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। জানি যে-সব গরীব ছাত্র তাঁর বাড়ীতে থেকে এখানকার কলেজে পড়ে, তাদের কাউকে বললে এখনই সে বিনা পয়সায় পড়াতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু এও জানা কথা যে তিনি কখনও সে অনুরোধ করবেন না তাদের কাউকে।...এমন সদাশয় ধর্মভীরু লোকের সম্পর্কে আসতে পারাও ভাগ্যের কথা!

একটু আমতা আমতা করে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

সে বয়সের আশাবাদী মন, সব জিনিসে শুভের ইঙ্গিত খুঁজে পায়। ওকালতিতে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই খুব পশার হবে, এই কথা ভেবে মন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সেই সন্ধ্যা থেকেই মহেশবাবুর নাতি-নাতনীদের পড়ানো আরম্ভ করে দিই।

ওকালতি আরম্ভ করে, প্রথম কয়েকদিন চিরাচরিত প্রথানুযায়ী পুরনো উকিলদের বাড়ী আলাপ পরিচয় করতে যাই। 'এসেছেন—বেশ! বেশ!"—এমনি ভাব প্রত্যেকের। যাঁরা করে খাচ্ছেন তাঁরা বললেন—"ওকালতি এমন একটা লাইন, যেখানে মনীষা থাকলে তার

স্বীকৃতি হবেই হবে।" যাঁদের পশার কম, তাঁরা বললেন, "সে দিনকাল আর নেই। এ পেশা এখন একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পশার জমাতে হ'লে শুধু খোশামোদ করতে হবে দালালদের আর হাকিমদের। আইন জানবারও দরকার নেই, বই পড়বারও দরকার নেই।"...বুড়ো সরকারী উকিল নিষেধ করলেন নেক্-টাই ব্যবহার করতে; উকিলে গলাবন্ধ কোট পরলেই নাকি জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা খুশী থাকেন।

এরপর বার-লাইব্রেরীতে গিয়েও নিস্তার নেই। অজস্র অযাচিত উপদেশ নীরবে গিলতে হয় প্রত্যহ। কিন্তু নিজের মক্কেলের কাছ থেকে একদিনের জন্যও একটা দুটো টাকা পাইয়ে দেবেন এই নবাগত উকিলকে, সে লক্ষণ দেখা গেল না কারও।

অন্য উকিলদের গতিবিধির উপর নজর রাখা প্রত্যেক উকিলের ডিউটির মধ্যে পড়ে। তিন দিনের মধ্যে দেখি যে, আমার প্রাইভেট টুইশানি করবার কথা বার-লাইব্রেরীর প্রত্যেকে জেনে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল অযাচিত উপদেশের নূতন স্রোতের ধারা।... প্রাইভেট টুইশানি করে জানতে পারলে, মক্কেলরা নাকি মরে গেলেও সে উকিলের কাছে যায় না।..."ছেলে পড়িয়ে ওকালতি পেশা আরম্ভ করলে, শেষ পর্যন্ত ওই ছেলেই পড়াতে হবে পেট চালানর জন্য। আপনার ভালর জন্যই বললাম কথাটা।...যা ভাল বিবেচনা করেন করবেন।"...

দিন কয়েক কারও কথায় কান দিইনি। তারপর একদিন বুড়ো সরকারী-উকিল আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন একান্তে। কোটের গলার বোতাম আমি খুলে রাখি কেন এই প্রশ্নটি করবার পরই তুললেন আমার প্রাইভেট টুইশানির কথাটা। ও সম্বন্ধে বার-লাইব্রেরীতে শোনা উপদেশের পুনরাবৃত্তি করলেন তিনিও। এরপর আর উপদেশটিকে নেহাত ফেলনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।...

সত্যিই তো! তাঁর মত বুড়ো মানুষের আমার প্রতি সদিচ্ছা ছাড়া আর কি স্বার্থ থাকতে পারে!...

ঠিক করে ফেললাম যে মহেশবাবুর নাতিনাতনীকে পড়ানো ছেড়ে দেবো। আর যাবনা।...বুঝি যে সেই সদাশিব বৃদ্ধ দুঃখিত হবেন। কিন্তু উপায় কি?

টুইশানি ছেড়ে দেবার কথা মুখে নিয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে। তার চেয়ে চিঠিতে সব কথা গুছিয়ে লেখা অনেক সহজ। তাই করলাম শেষ পর্যন্ত।

হট্ করে লোকের কথায় একটা রোজগারের রাস্তা বন্ধ করে ফেলে, খুব অসুবিধায় পড়তে হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার বরাত ভাল। সেদিন কোর্ট কম্পাউণ্ডের মধ্যেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কলেজের সহপাঠী হরিশ সরকারের সঙ্গে। সেও অবাক, আমিও অবাক। সে এখানে ইনকামট্যাক্স অফিসার হয়ে এসেছে, এ খবর আমার জানা ছিল না। সে ছিল ক্লাসের বেশ ভাল ছেলে; আর আমি ছিলাম পিছনের বেঞ্চের দলে। সেইজন্য কলেজে তার সঙ্গে সে রকম বন্ধুত্ব ছিল না। কিন্তু বিদেশে হঠাৎ দেখা হওয়ায় সে আন্তরিক আনন্দিত হল। আমায় ধরে নিয়ে গেল অফিসে তার বসবার ঘরে। চা এল। বহুক্ষণ ধরে গল্পগুজব হ'ল।

পরের দিনই দেখলাম রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে চারিদিকে, যে ইনকামট্যাক্স অফিসার আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দু'জন অপরিচিত রাজস্থানী ব্যবসাদার আমাকে অযথা নমস্কারও করল রাস্তায়।

এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখি একটি দুটি করে মক্কেল জুটতে আরম্ভ করেছে, আমাকে দিয়ে তাদের ইনকামট্যাক্স-রিটার্ণ লেখাবার জন্য। ব্যাপার দেখে শুনে ইনকামট্যাক্স আইনের বইয়ের জন্য অর্ডার দিলাম—ওকালতিতে ঐ লাইনেই বিশেষজ্ঞ হব ঠিক করে।

এদিকে মহেশবাবুর বাড়ির টুইশানির জের তখনও মেটেনি। প্রথম দিন মহেশবাবুর বাড়ীর চাকর আমার নামে একখানা চিঠি নিয়ে হাজির। খুলে দেখি তার মধ্যে তিনখানি পাঁচ টাকার নোট আর একখানি এক টাকার নোট। যে ক'দিন কাজ করেছিলাম তার মাইনে। যোল দিনের যোল টাকা।

টাকাটা নিতে আমার বিবেকে বাধলো। আমাকে সাহায্য করবার জন্য তিনি চাকরিটা দিয়েছিলেন। আমি দিন কয়েকের মধ্যে স্বেচ্ছায় সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। ও টাকা কখনও নেওয়া যায়?...

সেই চাকরের হাতেই টাকা কয়টা ফেরত দিলাম। এক টুকরো কাগজে লিখেও দিলাম "টাকা কয়টি দিয়ে অযথা আমায় লজ্জা দিচ্ছেন কেন?"

ভাবলাম ব্যাপারটা মিটল; কিন্তু মহেশবাবু নিশ্চিন্ত হতে দিলেন না। দিন তিন চার পরেই মনিঅর্ডার এল একখানা আমার নামে। প্রেরক মহেশবাবু। কুপনে লেখা—"মনিঅর্ডার কমিশন বাদ দিয়া পনর টাকা বারো আনা পাঠাইলাম।"

মহা ফাঁপরে পড়লাম।...এক পাড়ার মধ্যে এখান থেকে এখানে মনিঅর্ডার! ডাকপিয়নের চোখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারিনা মনিঅর্ডার ফেরত দেবার সময়।

ফেরত দিয়েও নিস্তার নেই। দিন কয়েক পর আবার টাকা এল। এবার পনর টাকা আট আনার। পিয়নের চোখেমুখে কৌতুকের হাসি। এবার মনিঅর্ডার ফেরত দেবার সময় সে বুঝে গেল যে, আমার আর মহেশবাবুর মধ্যে এ একরকম খেলার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এ খেলায় আনন্দ নেই। প্রতিযোগিতায় খেলবার সময়ের মত একটা জেদাজেদির ভাব এসে পড়েছে আমার মনে। প্রতিবার টাকা ফেরত দেবার মুহূর্ত থেকে প্রতীক্ষা করতে হয় পরের মনিঅর্ডারের

জন্য। এ ধৈর্যের পরীক্ষায় যে কি মানসিক অস্বস্তি, তা বলে বুঝোবার নয়। একমাত্র ভরসা যে ক্রমেই কমে আসছে টাকাটা।

এইভাবে চলতে চলতে যেদিন টাকাটা শেষ হল সেদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তখন কয়েক আনা পয়সা বাকি; পোষ্টঅফিসের নিয়ম অনুযায়ী সে কয়েক আনা মনিঅর্ডারে পাঠানো যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় বসে আছি। বালাপোশ গায়ে, খড়ম পায়ে মহেশবাবু এসে ঢুকলেন। বাড়িতে তাঁদের দুখান গাড়ী, তবু এই শীতের রাত্রে বৃদ্ধ হেঁটে এসেছেন! বনেদী পরিবারের লোক—অযথা বাড়ীর বাইরে বার হওয়া চিরকালই কম; আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকায় নিজের কম্পাউণ্ডের বাইরে আসা তাঁর আর ঘটে ওঠে না কখনও। এহেন মহেশবাবু এই গরীবের কুটিরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন! প্রণাম করে তাঁকে বসবার চেয়ার এগিয়ে দিই। মাইনের টাকার কথাটা বোধ হয় আবার তুলবেন ভেবে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি।

"একটা কাজে এলাম তোমার কাছে। তোমাকে আর কিন্তু আপনি বলতে পারব না—এখানকার বাসিন্দেই যখন হয়ে গেলে।..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি আপনার নাতির বয়সী; আমাকে তুমি বলবেন না তো কি বলবেন।"

"অনেকদিন আগেই আসতাম। কিন্তু তোমার পাওনাটা চুকিয়ে দেবার আগে তো তোমার কাছ থেকে কোন কাজ নিতে পারি না—জানোই তো আমায়। বিবেকে বাধে। শুচি-বাইএর মত এও একরকম রোগ কিনা, জানি না। তবে কারও পাওনা মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত নিজেকে কেমন যেন দোষী দোষী মনে হয়। জেনেশুনে তো কোন লোককে ফাঁকি দিইনি আজ পর্যন্ত; অজানতে আবার কারও পাওনা

ফাঁকি দিয়ে ফেলি, সেই ভয়ই আমার অষ্টপ্রহর। তাহলে যে সেখানে গিয়ে ফাঁকিতে পড়ব নিজেই। তিনি যে ওপর থেকে সবই দেখছেন! ...এই নাও। ধরো। এই কাগজগুলো দেখে রেখো। আমার ইনকামট্যাক্সের। তোমার সঙ্গে তো শুনি ইনকামট্যাক্স অফিসারের খুব আলাপ। আমার রিটার্নটা তোমাকে দিয়েই দাখিল করাব ঠিক করেছি। বসাকদের গোলা থেকে পাওয়া সুদের টাকাটা দিওনা রিটার্নে। অফিসার পরে যদি গোলমাল টোলমাল করে, তখন তুমি তো আছই। সরকারী-পাওনার ব্যাপার।—সব বেশ গুছিয়ে বাঁচিয়ে লিখো। এখনকার মত এই ষোল টাকা রাখ ; পরে আরো দেবো।—আচ্ছা আজ তাহ'লে উঠি। নারায়ণ! নারায়ণ!"

বৃদ্ধ চলে গেলেন।

তাঁর কাছ থেকে এ ষোল টাকা নিতে আর আমার কোন বিবেকের বাধা ছিল না। এ যে আমার ওকালতির ন্যায্য ফী! দমকা রোজগারের তৃপ্তি নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসি, বৃদ্ধের কাগজপত্রগুলো একবার নাড়াচাড়া করবার জন্য। হঠাৎ নজরে পড়ল। টেবিলের উপর দেখি রাখা রয়েছে কয়েক আনা পয়সা। গুণে দেখলাম ঠিক সেই বাকি ক' আনা।

মুষ্টিযোগ

'লাইন দিয়ে! লাইন দিয়ে! এক এক করে! এক এক করে!' হাঁক শোনা গেল উপেন্দ্র হোমিও-ফার্মেসীর পাশের তামাক-খাওয়ার ঘর থেকে। যতবার একখান করে রুগী-ভরা গাড়ি পৌঁছবে, ততবার এই চিৎকার শোনা যাবে।

সম্মুখের মাঠে গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ির ভিড় লেগেছে। দূর থেকে রুগীরা এসেছে উপীন ডাক্তারকে দেখাতে। রোজই অগুণতি রুগী আসে—আজ আবার হাট-বার।···

···ছুটকো ছাটকা রুগী যায় বটে যুদ্ধফেরৎ অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জির কাছে। কিন্তু সাতঘাটের জল খাওয়ার পর যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন আসতেই হয় উপীন ডাক্তারের কাছে। অন্য ডাক্তাররা রুগী হাতে রাখবার জন্য রোগ জীইয়ে রাখে; তেমন পাওনি আমাদের উপীন ডাক্তারকে! বিশ্বাস নিয়ে খেলে, ওঁর এক ফোঁটা ওষুধেই রুগী চাঙ্গা হয়ে ওঠে; গোলমেলে রোগ হলে বড় জোর দরকার হয় তিন ফোঁটার। কিন্তু সত্যিকার বিশ্বাস চাই।···

তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে আশপাশের খানকয়েক গ্রাম জুড়ে বেশ একটা হোমিওপ্যাথির আবহাওয়া তয়ের করে ফেলেছেন। এরই

ফলে অ্যালোপ্যাথ চ্যাটার্জি ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর মন কষাকষির অন্ত নেই।

ডিসপেনসারি ঘরের দেওয়ালে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো দুইটি উপদেশবাণী। প্রথমটিতে সকলকে মনে করিয়ে দেওয়া যে 'বিশ্বাস না থাকিলে ঔষধে কোন ফল হয় না।' দ্বিতীয়টিতে তর্জনী সঙ্কেত দিয়ে লেখা—'ঔষধ সেবনকালে তামাক খাওয়া এবং সিঁদুর ব্যবহার করা বারণ। মেটে সিঁদুর চলিতে পারে।'

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের উপর বিশ্বাসে উপীন ডাক্তারের একটুও ভেজাল নেই বলে, অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আসা রুগী দেখলেই তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে। তাঁর মনের এই দিকটির খবর গজাল চৌকিদারের সঠিক জানা ছিল না। সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বিনা পয়সায় দেখাতে। চৌকিদারী বুদ্ধিতে ভেবেছিল যে চ্যাটার্জি ডাক্তারের নিন্দা মুখে নিয়ে ঢুকলে উপীন ডাক্তার খুশী হবেন। তাই সে আরম্ভ করে—"গিয়েছিলাম চ্যাটার্জি ডাক্তারের কাছে একে দেখাতে। তিনি বললেন—অনেকগুলো ইনজেকশন দিতে হবে—অনেক খরচ—তার চেয়ে উপীন ডাক্তারের জল তুমি খাইয়ে দেখ।...শোন একবার কথা! উপীন ডাক্তারের জল।...এই রকম খোঁচা মারা কথাই বলে চ্যাটার্জি ডাক্তার।"

উপীন ডাক্তার লোক চরিয়ে খান। বুঝে গেলেন যে গজাল চৌকিদার ওষুধের দাম দেবে না।...ঘর ভরা রুগী। শুধু কি রুগী দেখা! ওষুধ দেওয়া, ওষুধের দাম নেওয়া, প্রত্যেককে একবার করে 'আজ তামাক খেয়োনা' বলা, সব কাজ তাঁকে একা হাতে করতে হয়। এখন তাঁর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। গজালকে ইশারায় চুপ করতে বলে তিনি হাঁক দিলেন—"ভন্তু! ওরে ভন্তা!"

"আজ্ঞে যাই।"

কড়া শাসন বাপের—ডাকের উত্তরে সব সময় আজ্ঞে বলবি! ভন্তু তাঁর একমাত্র ছেলের নাম। বছর আষ্টেক বয়স। বেশ চটপটে চালাকচতুর ভাব। ডাক শুনেই সে বুঝে গিয়েছে ব্যাপারটা। মেয়ে রুগীর পয়সা না দেবার লক্ষণ বুঝতে পারলে, তাকে উপীন ডাক্তার পাঠিয়ে দেন বাড়ীর ভিতরে। এদের ওযুধ দেন ভন্তুর মা। হোমিও-প্যাথির পরিবেশে থাকতে থাকতে তিনি নিজেও ওযুধ দিতে শিখেছেন। স্বামীর সঙ্গে হোমিওপ্যাথির গল্প করতে ভালবাসেন। সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ইউনানের অদ্ভুত চিকিৎসার কথা স্বামীর মুখে প্রত্যহ শুনলেও, তাঁর একঘেয়ে লাগে না। ইউনান সাহেব রোগীদের তামাক খেতে ও সিঁদুর ব্যবহার করতে বারণ করেছিলেন, একথা শুনবার পর থেকে ভন্তুর মা কর্তব্যবোধে মেটে সিঁদুর দেন সিঁথিতে। স্বামীকে মধ্যে মধ্যে তাড়া দেন, ডিসপেনসারির পাশেই বন্ধুদের জন্য একখানা তামাক খাওয়ার ঘর করে দিয়েছেন ব'লে। উপীন ডাক্তার স্ত্রীকে বুঝোন যে এই ঘরে বিনা পয়সায় তামাকের ব্যবস্থা আছে বলেই অ্যালোপ্যাথি-বিরোধী দল হাতে থাকে;—ও পাট উঠিয়ে দিলে তো চ্যাটার্জিরই পোয়া বারো! ডিসপেনসারি ঘরে তামাকের ধোঁয়া না এলেই হ'ল।…এ যুক্তির জবাব না দিতে পেরে, ভন্তুর মা রাগে গজ গজ করেন।

ওযুধের ছোট বাক্সটি আলমারি থেকে বার করে ডাক্তারবাবু ছেলের হাতে দিলেন। গঙ্গালের বউ ভন্তুর সঙ্গে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

উপীন ডাক্তার রোগী দেখে চলেছেন। দেখা শেষ করে প্রত্যেককে বলছেন—তামাক খেয়োনা আজকে। পাশের তামাক খাওয়ার ঘর থেকে মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে—'এক এক করে।' 'লাইন বেঁধে।' তাঁকে শুনিয়ে বলা। বিনা পয়সায় তামাকের দাম শোধ করছেন চ্যাটার্জি-বিরোধী দলের পাণ্ডারা।

গঙ্গাল চৌকিদারের কথার জের হিসাবে উপস্থিত রুগীদের মধ্যে চ্যাটার্জি ডাক্তারের বিদ্যার দৌড় সম্বন্ধে নানারকম টীকা-টিপ্পনী চলতে লাগল। সর্বসম্মতিতে ঠিক হয়ে গেল যে, এক শুধু কাটাকুটি ছাড়া, অ্যালোপ্যাথি শাস্ত্রে আর কিছু নেই।

কিন্তু শেষ হয়েও, কথা শেষ হয় না। একজন দাড়িওয়ালা লোক বলে "চ্যাটার্জি ডাক্তার বলছিলেন আমার কাছে, যে জ্বরের হোমিও-প্যাথিক ওষুধ নেই। সেইজন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের বাড়ির কারও কালাজ্বর হলে, তাকে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়তে হয়। 'হোমিওপ্যাথ'এর ছেলের শক্ত ব্যামো হ'লেই দেখবে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করায়; ম্যালেরিয়া হ'লে লুকিয়ে অ্যালোপ্যাথি বড়ি খাওয়ায়।"

আর থাকতে পারলেন না উপীন ডাক্তার। "এত বছর তো এখানে হয়ে গেল! কেউ বলতে পারে যে একদিনের জন্যও অ্যালো-প্যাথিক ওষুধ খেয়েছি, আমি বা আমার বাড়ির অন্য কেউ? কলকাতার হোমরা-চোমরা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা নিজেদের বাড়িতে কারও বাঁকা অসুখ হলেই, গিয়ে কেঁদে পড়ত ডাক্তার ইউনানের কাছে, তাঁর ওই এক ফোঁটা ওষুধের জন্য! দেখেছি তো! কলকাতায় হাজার হাজার অ্যালোপ্যাথি পাস করা ডাক্তার, নিজের শাস্ত্র ভুল ব'লে ছেড়ে দিয়ে আজকাল হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেয়! দেখেননি?"

প্রশ্নটি করা দয়াল সাহার দিকে তাকিয়ে। দোকানের মাল কিনতে দয়ালকে মাঝে মাঝে কলকাতা যেতে হয়। এ অঞ্চলে কলকাতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে তাই তার খ্যাতি আছে। সে ঈষৎ হাসির মধ্যে দিয়ে উপীন ডাক্তারের কথায় সায় দেবার ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। দাঁতের ব্যথায় গালগলা ফুলে উঠেছে,—বেশী হাসতে গেলে লাগে।

যাক! সব খবর রাখে কলকাতার, এমন লোকও এখানে আছে

তাহলে ! চব্বিশ ঘণ্টা ভূতের বেগার খাটার মধ্যে এইটুকুই সান্ত্বনা উপীন ডাক্তারের।...

ডাক্তারবাবু যখনই দয়াল সাহার দিকে তাকিয়ে কলকাতার কথা বলেছেন, তখনই লাইন ভেঙ্গে, অন্য রুগীদের চাইতে আগে দেখাবার দাবি স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে তার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য রুগীরা ডাক্তার-বাবুর দিকে তার এগিয়ে যাবার পথ করে দিল।

"ভাল করে খুলে ফেল কম্ফটারটা। গালের ঐ ফোলা জায়গাটাতে কি লাগিয়েছ ? টিঞ্চার আইডিন ?"

দয়াল সাহা ভাবেনি যে ডাক্তারবাবু আবার তার কম্ফটার খুলিয়ে ফোলা দেখবেন,—তিনি যে চিরকাল রোগের লক্ষণ শুনেই ওষুধ দেন !...একটু ঢোক গিলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, সে উত্তর দেয়—"প্রলেপের কি যেন একটা ওষুধ—নাম জানি না—চ্যাটার্জি ডাক্তার দিয়েছিলেন পরশু—টনটনানি ব্যথা—কিছুই উপকার পাইনি—কাল সারারাত জেগে"...

"লাইন দিয়ে !" "লাইন দিয়ে !" "এক এক করে !"

গম্ভীর হয়ে উঠেছে উপীন ডাক্তারের মুখ। এই দয়াল সাহার মত রুগীকেই তিনি লাইন ভেঙ্গে আগে আসতে দিয়েছিলেন

"তুমি সকলকে ডিঙিয়ে আগে এসেছ কেন দয়াল ? ! নিজের জায়গায় যাও ! যখন তোমার পালা আসবে তখন এস !"

একটি মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ খেলে গেল, এই আদেশের সমর্থনে।

এর পর যখন দয়ালের পালা এল, তখনও ডাক্তারবাবুর রাগ পড়েনি।

"হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস না থাকলে কি ওষুধে ফল হয় !"

"বিশ্বাস না থাকলে কি আপনার কাছে ছুটে এসেছি ! কি যে ভাবেন !"

"ভাবি ঠিকই! বাটপাড়দের ওষুধে যখন আর থই পাওনি, তখন এসেছ! এবার থেকে ভাবছি অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের ওখান থেকে ঘুরে আসা রুগীদের কাছ থেকে এক আনা করে বেশী নেবো, প্রতি দাগে। তোমাকে দিয়েই আরম্ভ করলাম দয়াল—এই এখন থেকেই! ...এই নাও ওষুধ তিন দাগ। এ হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের বিষ নষ্ট করবার জন্য।...আজ তো কিছু করবার উপায় রাখনি—কি করব বলো?...কালকে আসল রোগের ওষুধ দেবো।...তামাক খেয়োনা আজকে।"

দয়াল চলে গেল। ঘরের আবহাওয়া তখনও বেশ থমথমে। ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর দেখলে, রুগীরাও মুখ গম্ভীর করে থাকে। আস্তে আস্তে কথা বলতেও সাহস পায় না;—যা রাশভারী লোক উপীন ডাক্তার!

রুগী দেখবার বিরাম নেই।

প্রতীক্ষার একঘেয়েমি কাটানর জন্য একটি বুড়ো লোক বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করতেই ঘরের সকলেই হাঁ হাঁ করে ওঠে। ধরে মারে আর কি তাকে। কোথাকার উজবুক লোকটা!

লোকটার জবাবে বোঝা গেল যে, সবাই তাকে ৎটা বেকুফ ভাবছিল, ততটা সে নয়। ওষুধ খাওয়ার পর ত্ত আর তামাক খাওয়া চলবে না; তাই সে ভেবেছিল এখনই একটি ড়ি খেয়ে নেওয়া যাক আরাম করে—ওষুধ খাওয়ার আগেই।

এ কথায় খেপে উঠল সকলে।

"হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যে ঘরে থাকে সে ঘরে বিড়ি, তামাক, সিগারেট কিছু খেতে নেই, একথা কাছাকাছি গ্রামের ছোট ছেলেটা পর্যন্ত জানে। আর তুমি জান না! কোন্ গ্রামে বাড়ি? হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করাতে আস, আর এইটুকু খবর রাখনা? জানলা

এখানে তামাক খাওয়ার ঘর আলাদা? দেখছ না ডাক্তারবাবুর বন্ধুরা ঐ পাশের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছেন!"…এতক্ষণে উপীন ডাক্তারের মনের মেঘ কাটে। সত্যিই তা'হলে কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা, বেশ হোমিওপ্যাথির ধরনে ভাবতে শিখে গিয়েছে! সার্থক হয়েছে তাঁর এতদিনকার নিষ্ঠা আর পরিশ্রম! প্রশান্তির স্মিতহাস্য ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। ওই সংক্রামক হাসিটিকে মুখে নিয়ে তিনি তাকালেন সকলের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে সকলে বুঝে গেল যে তিনি এইবার একটা কিছু হাসির কথা বলবেন।…নিজের তৈরী সেই ছড়াটা বোধ হয়!…হাসতে হবে এইবার।

সকলে নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল।

তাদের হতাশ না করে উপীন ডাক্তার ছড়া কাটলেন—

"অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার,
নির্ঘাত বাটপাড়।

এর চেয়ে বেশী আর আমি কিছু বলতে চাই না।"

দমকা হাসির তোড়ে ঘরের থমথমে ভাব কেটে গেল এতক্ষণে। নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামত গল্পগুজব করবার সাহস ফিরে পেয়েছে সকলে। এরপর আর সময় কাটতে দেরী লাগে না।…

শেষ রুগীটিকে তামাক খেতে বারণ করে ঘড়ির দিকে তাকালেন উপীন ডাক্তার। দেড়টা বেজে গিয়েছে।…এই ফাঁকে খাওয়াদাওয়া সেরে না এলে, হয়তো বিকালের রুগীরা আসতে আরম্ভ করে দেবে এখনই!…বাড়ি ঢুকবার আগে তামাক খাওয়ার ঘরে একবার হাজরি দিয়ে যাবার নিয়ম। হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সেবকদের সঙ্গে দুটো কথা না বলে যাওয়া ভাল দেখায় না।

গিয়ে দেখেন একা পোদ্দারমশাই ঘাঁটি আগলাচ্ছেন। বাড়ি

থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছেন। বাকি সকলে গিয়েছেন খেতে; ফিরে এই এলেন ব'লে! হুঁকোতে পোদ্দারমশায়ের জুত হয় না; নিজের গড়গড়াটি সেইজন্য তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

গল্প আরম্ভ করলে চ্যাটার্জি ডাক্তারের কথা এসে পড়বেই পড়বে। তাঁর ভুল রোগনির্ণয়ের আধুনিকতম দৃষ্টান্তের সজীব বিবরণ সবে জমে এসেছে; এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে চীৎকার শোনা গেল ভন্তুর মায়ের।

"ওগো কি হ'ল দেখ! শীগগির দেখে যাও!"

সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদারের হাঁকের মত চীৎকার আর একটি বামা-কণ্ঠের!...কি বলল বোঝা যায় না।...

ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়! এ চেঁচানির স্বরই যে আলাদা!...ভন্তু? সাপে কামড়েছে না হয় কূয়োয় পড়ে গিয়েছে!... নিশ্চয়ই!

চেঁচামেচি...হৈ-চৈ...মুহূর্তের মধ্যে একি ঘটে গেল!...

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন তাঁরা। তাড়াতাড়িতে পোদ্দার মশাই গড়গড়াটি হাতে নিয়েই এসেছেন। বারান্দায় মাদুরের উপর ভন্তু শুয়ে রয়েছে, মায়ের কোলে মাথা দিয়ে। কাছে দাঁড়িয়ে গজালের বউ; চৌকিদারসুলভ চীৎকারটি ছিল এরই। ভন্তুর মায়ের চোখে জল—পাগলের মত কত কি জিজ্ঞাসা করছেন ভন্তুকে। ছেলে কোন কথা বলছে না। স্থির হয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করছিল। হঠাৎ চোখ বুঁজে এল তার।...নীরব...নিস্পন্দ।...

কি ব্যাপার?

গজালের বউ একগলা ঘোমটা টেনে পাশে সরে দাঁড়াল। ভন্তুর মায়ের তখন পোদ্দার মশাইকে দেখে ঘোমটা দেবার কথা মনে নেই। তিনি দেখিয়ে দিলেন সম্মুখের গেলাস, আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের

ছোট বাক্সটি।...অনেকগুলি শিশির ওষুধ, এক গেলাস জলের মধ্যে মিশিয়ে ভন্তু খেয়েছে ;—ব'লল, খেতে নাকি তালশাঁসের জলের মত লাগে।...

"ক' শিশি ?"

"দেখনা। তা কি আমি গনেছি !"

হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন ভন্তুর মা।

উপীন ডাক্তার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের খালি শিশিগুলি গনলেন—ইপিকাক, চায়না, আর্নিকা, মার্ককর, মার্কসল, নাক্সভোমিকা, ক্যালকেরিয়া কার্ব—সবগুলি নিঃশেষ করে খেয়েছে ! সবগুলিই যে উঁচু 'ডাইলিউশন'-এর ওষুধ ছিল !

"হ্যাঁরে ভন্তু, সব শিশিগুলোই কি ভরা ছিল ? সাত শিশি ওষুধই কি তুই খেয়েছিস ? কথা বলছিস না কেন—কথা বল !...চোখ খুলে তাকা আমার দিকে।"

ভন্তুর সাড়াশব্দ নেই।

"তুমি আসবার আগে তবু চোখ খুলছিল। এখন কি হবে !"

ডাক্তার-গিন্নীর এই কাতরোক্তিতে পোদ্দার মশাই আর স্থির থাকতে পারলেন না। হাতের গড়গড়াটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে তিনি এগিয়ে এলেন।

—"না ডাক্তার, তোমরা পারবে না। তোমার কাছে বলতে ভন্তুর ভয় করছে। দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করছি। আপনি একটু সরুন তো।"

ভন্তুর মা একটু সরে বসলেন।

পোদ্দার মশাই ভন্তুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললেন—"ভয় পাস না ভন্তু। তোর মা-বাবা এখান থেকে উঠে গিয়েছেন। কেউ বকবে না। চোখ খুলবার দরকার নেই। শিশির

ওষুধ তুই খাসনি—না? ডেয়ো পিঁপড়ের গায়ে ওষুধ ঢেলে দেখছিলি যে পিঁপড়ে মরে কিনা এতে, নারে? নিজের গায়ে লাগিয়েছিলি নারে? গায়ে লাগালে কেমন এসেন্সের মত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে নারে? কেউ বকবে না। বল! দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে, ওষুধের ম্যাজিক করেছিলি নারে? ছোটবেলায় আমরাও ওরকম কত করেছি। ভয় কি—বল!"...

সব বিফল হল। ভন্তু কাঠের তক্তার মত পড়ে রয়েছে, শক্ত হয়ে।

ছেলের মা থাকতে পারলেন না।...

ছেলের জীবনমরণ নিয়ে কথা; আর এরা এখনও জেরা করেই চলেছে!...লজ্জাশরম ভুলে তাড়া দিয়ে উঠলেন স্বামীকে "আমি নিজে দেখেছি ওকে খেতে আর তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? এখন বাজে কথা বলে সময় নষ্ট না করে, কিছু ব্যবস্থা কর—যাতে এইসব কড়া কড়া ওষুধের বিষ কাটে।"

"দাঁড়াও আমি বরঞ্চ চ্যাটার্জি ডাক্তারকে ডেকে আনি।

পোদ্দার মশায়ের এই কথা স্বামী-স্ত্রী কারও কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন চ্যাটার্জি ডাক্তারকে খবর দিতে।

বিপদের মুখে কোন বুদ্ধি যোগায় না।

গুটি গুটি লোক জমতে আরম্ভ করে ডিসপেনসারি ঘরে। চৌকিদার গিন্নীর চীৎকার বোধহয় এদের কানে গিয়েছিল। দরজার ওদিক থেকে নানারকম উপদেশ শোনা যেতে লাগল।...

'বমি করানো দরকার এখন।'

'নুন গুলে খাওয়ালে হয়না?'

'না হয় মাছের আঁশ?'

"চুলটুল কিছু দিয়ে গলার ভিতর সুড়সুড়ি দিলে কেমন হয়?"

"খাওয়ানো যাবে তো? দাঁতটাত লেগে গিয়েছে কিনা দেখে নিন, আগে একবার।"

"নেশা হয়নিতো? হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যে খাঁটি রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট। অতটুকু ছেলে কখনও অতখানি রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট সহ্য করতে পারে? একবার চ্যাটার্জি ডাক্তারকে ডাকা দরকার।"

এই বিপদের মধ্যেও উপীন ডাক্তার বুঝে গেলেন যে শেষ বক্তাটি চ্যাটার্জি ডাক্তারের দলের লোক। রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটের জন্য চিন্তিত নন তিনি। আসল বিপদ এতগুলো উঁচু ডাইলিউশন এর ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। এর কি সোজা ধক! আজ না হোক, কোন না কোন দিন অন্য একটা রোগ হয়ে ফুটে বেরবে।...

আসন্ন বিপদের কথা ভেবে গজালের বউয়ের মুখ বিষাদে ভারি হয়ে উঠেছে। চোখের উপর এই জিনিস দেখবার জন্যই কি সে এখানে থেকে গিয়েছিল! ওষুধের দাম পুষিয়ে দেবার জন্য দুখান ঘুঁটে ঠুকে দিচ্ছিল ডাক্তারবাবুর বাড়ির—এরই মধ্যে এই কাণ্ড! দেখ দিকি, কিসে থেকে কি হ'ল! হে ভগবান! ডাক্তারবাবুর যে এই একটিমাত্র ছেলে।...মাঝ থেকে সে-ই হ'ল নিমিত্তের ভাগী! তারই জন্য তো ওষুধের বাক্স আনা হয়েছিল বাইরে থেকে! ছেলেপিলের হাতে কখনও এই সব ধকওলা জিনিসের বাক্স দিতে আছে। খোকাবাবু খাওয়ার সময় শিশিগুলিতে খুব অল্প অল্প ওষুধ ছিল,—এমনি করে দাও হে ভগবান!...

...ডাক্তারবাবু ছেলের নাড়ি দেখছেন। ছেলের মা তার দিকে চেয়ে।...হে ভগবান, বাঁচিও ছেলেটাকে!...আহারে মাতো!... গজালের বউয়ের একটা কথা মনে পড়ে। ফিস ফিস করে ঘোমটার মধ্যে থেকে ভস্তুর মাকে বলে—

"আমাকে যে খানিক আগেই সিঁদুর ব্যবহার করতে বারণ করলেন ওষুধের ধক কেটে যাবে বলে, তা' সেই সিঁদুর খানিকটা খোকাবাবুর

কপালে লাগিয়ে দিলে হয় না? তাহলে তো এই সব জোরালো ওষুধের ধক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মুখ্যু মানুষ, আমরা তো সব বুঝি না।"…

"ওমা তাইতো!"

ছুটে গেলেন ভন্তুর মা ঠাকুরঘরে। জলচৌকির নীচে প্রণাম করে উঠিয়ে নিলেন লক্ষ্মীর সিঁদুরকৌটোটি। এ হচ্ছে আসল সিঁদুর; লক্ষ্মীর কৌটোয় মেটে সিঁদুর রাখতে নেই; এখানে ছাড়া বাড়িতে নিজের ব্যবহারের জন্য যেটুকু আছে, সেটুকু মেটে সিঁদুর। লক্ষ্মীর কৌটোর সমস্ত সিঁদুরটুকু তিনি এনে ঢেলে দিলেন ছেলের মাথায়।…ডবল গুণ এই ঠাকুর দেবতার সিঁদুরের! উপীন ডাক্তার প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন ভন্তুর বুঝি অমঙ্গল কাটানোর জন্য ঠাকুরদেবতার আশীর্বাদী সিঁদুর কপালে ছোঁয়াচ্ছেন ছেলের। ঠাকুরদেবতার দিক ছাড়া সিঁদুরের যে একটা ডাক্তারী দিক আছে, একথা খেয়াল হ'ল পরে—স্ত্রীর মুখ-চোখের ভাব দেখে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মাথায় খেলে গেল, হোমিওপ্যাথি ওষুধের ধক কাটানোর, আরও জোরালো জিনিসের কথা। কি করে যেন সহধর্মিণীও বুঝতে পারলেন স্বামীর মনের ভাব। অথই সমুদ্রে কূল দেখতে পেয়েছেন দুজনে। একই সঙ্গে।…একথা এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন, তাই ভেবেই আশ্চর্য লাগে! এত জানা—তবুও …

পোদ্দার মশায়ের গড়গড়াটি সম্মুখে মেঝের উপর রাখা ছিল। গড়গড়ার নলটা খুলে উপীন ডাক্তার সহধর্মিণীর হাতে দিলেন।

"ভাল করে ধর দুহাত দিয়ে নলটা ওর মুখের সম্মুখে। আমি তামাকে টান মেরে মেরে, নলের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে ধোঁয়া চালিয়ে দি এখান থেকে।"

পাড়ার রাঙ্গাদিদিমা চেঁচামেচি শুনে দেখতে এসেছেন। বাড়িতে ঢুকে প্রক্রিয়াটি দেখে কি বুঝলেন তিনিই জানেন; বললেন—"তাতে কি হয়েছে! আমার সম্মুখে তামাক খেলে!"

গজালের বউ ঘোমটার মধ্যে থেকে জানিয়ে দিল যে, এ আসল তামাক খাওয়া নয়; এ হচ্ছে ওষুধের বিষ কাটানোর ওষুধ; সিঁদুরের মত।...

"তাই বলো!...তুমি নিজেই কাশছ যে উপীন! অভ্যাস নেই কিনা।...একজন পাকা তামাক-টানিয়ে লোকের দরকার এখন! নল দিয়ে কি ধোঁয়া দেওয়া যায় অমন করে। ধোঁয়া যাচ্ছেনা মোটেই! হাঁ করিয়ে মুখের মধ্যে ধোঁয়া ঢোকাতে, তবে না!...নাতবউ দেখতো দাঁত লেগে নেইতো ভম্বর?...ও গজালের বউ খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ছাখ দেখি খুঁজে পেতে একখানা চামচ পাস কিনা ওই বারান্দায়। দাঁত খোলাতে হবে।"...

দরজার বাইরে পোদ্দার মশায়ের কাশির সাড়া পাওয়া গেল।

"ডক্টর চ্যাটার্জি এসেছেন, পেট থেকে পাম্প করে ওষুধ বার করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমরা ঢুকছি।"...

হঠাৎ বিষম লাগল উপীন ডাক্তারের। নিশ্চয়ই তামাকের ধোঁয়া গলায় লেগে। অন্য কোন কারণে নয়।

ভম্ভু চোখ খুলেছে!...ওষুধের ফল ধরেছে তা'হলে! আনন্দের দীপ্তি লাগল মা-বাবার চোখে-মুখে।

পেট থেকে ওষুধ বার করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে চ্যাটার্জি ডাক্তার এসেছেন শুনে, ভম্ভু ভয়ে চোখ খুলে ফেলেছিল। সে বুঝে গিয়েছে যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো খাওয়ার জন্য বাবা আজ আর মারধোর করবেন না তাকে।...বাবা ঠিক ধোঁয়া দিতে পারছেন না নলের মধ্যে দিয়ে। কাশছেন। সে নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করেছিল একদিন।...

ডাক্তার চ্যাটার্জির কাটাকুটির ভয়ে, বাবার ভয় কাটিয়ে ভম্ভু বলল—"নলটা গড়গড়ায় লাগিয়ে আমাকে দেন; আমি নিজে নিজে টানতে পারব।"...

কাশি থামিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন উপীন ডাক্তার।···আত্মসম্মান বজায় থাকবার তৃপ্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গর্ব।

চেঁচিয়ে বললেন—"অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে কে ডেকে আনতে বলেছিল! ডক্টর চ্যাটার্জিকে ভিতরে আনবার দরকার নেই, পোদ্দার মশাই। আমাদের ওষুধেই কাজ হয়েছে। ··হেঃ!"···

রাজকবি

নতুন ডাকপিয়নটার একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব, "দেখুন তো চিঠিখানা আপনাদের কিনা।"

বাবা মারা গিয়েছেন, বাইশ বছর আগে। তাঁরই নামে চিঠি। তিনিও ডাক্তার ছিলেন, আমারই মত। নামের আগে ডাক্তার কথাটা দেখেই হয়ত পিয়ন কিছুটা আন্দাজ করে থাকবে। [illegible] চিঠি কে দিল? পোষ্ট-অফিসের ছাপ পড়া যায় না। খুলতেই ন[illegible] পড়ে—Yours sincerely, Ramjash Bhattacharji. রামযশ ভট্টাচা[illegible] এঁর কথা কি এখানকার লোকে ভুলতে পারে! গৌরী সেন বা নি[illegible]ম সর্দারের মত তিনিও যে বেঁচে থাকবেন চিরকাল, একটি স্থা[illegible] বাক্যরীতির কল্যাণে। অলঙ্কার-বহুল বাজে ইংরাজীতে লেখা কোন [illegible]ছু দেখলেই এখানকার লোকে বলে—"এযে দেখছি রামানন্দী-নোটি[illegible] বাবা!" এই রামানন্দী হচ্ছেন শ্রীরামযশ ভট্টাচার্য। আমরা, অর্থাৎ তাঁর ছাত্ররা, অবশ্য শুধু এই কারণেই যে তাঁকে মনে করে রেখেছি তা নয়। মনে দাগ কেটে বসবার মত বহু কাণ্ড তিনি এখানে করে গিয়েছিলেন। সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া, এইটাই একজন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে মনে করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট; তার ওপর আবার যদি সেই মাস্টার

কপালে তিনটে তিলক কাটেন, বাবরি চুল রাখেন, তা'হলে তো কথাই নেই। তিনি এখানকার স্কুলে একনাগাড়ে অনেকদিন ছিলেন। প্রথমে ছিলেন অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার, পরে হয়েছিলেন হেডমাস্টার। আমরা প্রথমের দিকে বলতাম রামযশসার; পরে বলতাম এনজিনসার। বোর্ডিংএর ছেলেরা বলত যে, উনি যখন রোজ রাত্রে জপে বসেন, তখন নাকি রেলের এনজিনের মত হুসহুস করে শব্দ হয়। বোর্ডিংএ কোন নূতন ছেলে এলেই, পুরনো ছেলেদের ডিউটি হ'ত শীতের রাত্রে হেড-মাস্টারের কোয়ার্টারের বন্ধ জানলার নীচে বসিয়ে শব্দটা পরখ করিয়ে দেওয়া। সে সুযোগ, সে সৌভাগ্য আমাদের ছিল না; কেননা আমরা বাড়িতে থেকে পড়তাম। কেবল একদিন চেষ্টা করেছিলাম। সেদিন মশার-ডাক্তার ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি দেখাবেন স্কুলের হলঘরে। সেইজন্য রাত্রিতে স্কুলে যাবার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল বাড়ি থেকে। একটা বোর্ডিংএর ছেলের সঙ্গে, এনজিনের শব্দটা স্বকর্ণে শোনবার জন্য গুটি-গুটি এগচ্ছি অন্ধকারের মধ্যে, হঠাৎ এনজিনসারের গলার [illegible] কানে এসে লাগল বুলেটের মত, "কে? কে যায়?" ভাগ্যে সে যুগে টর্চলাইটের ব্যবহার ছিল না। দৌড় দৌড়, পিছন ফিরে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। পরদিনই নোটিস বার হয়েছিল গালভরা ইংরাজীতে, বোর্ডিংএর নোটিস বোর্ডএ—"সর্পসমাকীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া যে-কোন কারণে চলাফেরা করিবার সময় রাত্রিতে যেন লণ্ঠন সঙ্গে থাকে, নতুবা কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে।" ছেলেরা নোটিস পড়ে চোখটেপা-টেপি করে হেসেছিল। এর কিছুকাল পর একজন ছেলে বোর্ডিংএর পাশের নিমগাছটার উপর চড়েছিল দাঁতন পাড়বার জন্য। এনজিনসার বেত নিয়ে ছুটে এসেছিলেন বাড়ি থেকে। তারপর ছাত্রদের সতর্কবাণী দেওয়া নোটিস বেরিয়েছিল—"Henceforth, plucking of neem twigs will be considered as a sacrilege, and the culprits will

ও আড়ষ্টতা থাকে। আমাকে এই দুরদৃষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছে বাল্যবন্ধু নরেশ। অন্যসব বন্ধুরা কে কোথায় ছটকে পড়েছে, শুধু ও-ই এখানে থেকে গিয়েছে। হওয়া উচিত ছিল ওর কবি, কিন্তু হয়েছে কবিরাজ—পসার-প্রতিপত্তিওলা ভাল কবিরাজ। সময়ে অসময়ে সলাপরামর্শ নেবার জন্য, বা দুটো সুখদুঃখের গল্প করবার জন্য আমি ওরই কাছে যাই। এখনও চিঠিখানাকে পকেটে পুরে ওর কাছেই গেলাম।

"মহাসমস্যায় পড়েছি।"

"কি রে? কি ব্যাপার?"

"আগে কবিরাণীকে চা করতে বল তো, তারপর বলছি। বেদম প্রহার দিয়ে তোর কবিতা লিখবার অভ্যাস ছাড়াতে চেয়েছিলেন একজন, তাঁর কথা মনে আছে?"

"বাবার কথা বলছিস?"

"ধুৎ!"

"তবে?"

"এনজিনসারের কথা মনে আছে?"

হো হো করে হেসে ওঠে নরেশ। মনে পড়েছে তার পুরনো কথা। "মেরে কখনও কবিতা লেখা বন্ধ করা যায়! সে খুনেটা শেষ পর্যন্ত হার মেনে গিয়েছিল।"

এনজিনসারকে 'খুনে' বলায়, আর 'গিয়েছিলেন' না বলায়, বুঝে যাই যে তাঁর সম্বন্ধে ওর মনের ভাব, ত্রিশ বছরেও বদলায়নি। না বদলাবারই কথা—যা মার খেয়েছিল! দোষের মধ্যে সে বাকিংহাম প্রাসাদের ঠিকানায় ভারতসম্রাটের কাছে একখানা চিঠি লিখেছিল বিলাতের হ্যারো স্কুলে পড়বার খরচের জন্য। কবিতায় লেখা চিঠি। "ভূতলে অতুল প্রতাপশালী ব্রিটিশ কেশরী কেতন"—এই লাইনটা দিয়ে

চিঠিখানার আরম্ভ। সঙ্গে ভুল ইংরাজীতে অনুবাদ দেওয়া। বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর স্বাক্ষর, সীলমোহর ও মন্তব্য সম্বলিত হয়ে চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টারের কাছে ফিরে আসে, সমুচিত ব্যবস্থার জন্য। সে কি নির্দয় প্রহার! কেটে কেটে গায়ে বসে যাচ্ছে বেতের দাগ! এক ঘা করে বেত মারছেন, আর চীৎকার করে বলেছেন— "এই সব করে তোমরা আমার চাকরিটা খাবে! ইংরাজী শিখেছেন! কবিতা লিখছেন!"

ছুটির পর আমরা নরেশকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে, ডাকে ফেলবার আগে ইংরাজীটা এনজিনসারকে দিয়ে দেখিয়ে নিলে বোধহয় এত চটতেন না। এর দিন কয়েক পরে নরেশ নিজস্ব ধরনে এই প্রহারের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ইন্সপেক্টরসাহেব স্কুল ভিজিট করতে এসেছেন। এ ইন্সপেক্টরের পায়খানা দেখবার ঝোঁকের কথা সকলেই জানে। তাই হেডমাস্টার আগের দিন নিজে দাঁড়িয়ে পায়খানার দেয়ালের লেখাগুলোর উপর চুনকাম করিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্সপেক্টরসাহেব যখন দেখতে গেলেন, তখন দেওয়াল জুড়ে লালনীল পেন্সিল দিয়ে, বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল একটি কবিতা।

রামযশ গাইবার এনজিন বাজনা
বউকে নোটিস দেয়, শনিবার আজ না।

নরেশকে বলি—তুই নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবি। সে বলল—ধুৎ! বাঁ হাত দিয়ে লিখেছি।

পরদিন রামানন্দী নোটিস বার হল, "লালনীল পেন্সিল লইয়া কোন ছাত্র স্কুলে আসিলে দশটাকা জরিমানা করা হইবে।"

এই কবিতাই হয়ত পায়খানার দেয়ালের শেষ কবিতা হ'ত নরেশের; কিন্তু এনজিনসার তা হতে দিলেন না। হঠাৎ শোনা গেল গভর্ণমেন্টের খোশামুদে, আর চাকরি-অন্তপ্রাণ ভদ্রলোকটি কেন যেন কাজে ইস্তফা

দিচ্ছেন। প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেল সকলে। কে খুশী হ'ল, কে দুঃখিত, ঠিক বোঝা গেল না; সকলেই একবাক্যে তাঁকে চাকরি ছাড়তে বারণ করল। শহরের প্রবীণরা, কেন চাকরি ছাড়ছেন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি জবাব দিলেন—"আমার ইচ্ছা।" ক্যাশবাক্স, দোয়াতদানি, আরও কি কি যেন জিনিস তাঁকে দিয়ে, আমরা ঘটা করে ফেয়ারওয়েল মিটিং করলাম। জিনিসগুলো মিটিংএর পর হেডমাস্টারের কোয়ার্টারে পৌছে দিয়ে যখন আমরা ফিরব, তখন এনজিনসার খবর দিলেন যে গভর্ণমেণ্ট এখনও তাঁর ত্যাগপত্র মঞ্জুর করেনি; পুনর্বিবেচনা করতে লিখেছে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম যে, যদি উনি সত্যিই না যান, তাহলে কি ফেয়ারওয়েলের জিনিসগুলো নেওয়া ওঁর পক্ষে উচিত হয়েছে? রামানন্দী কিনা!

স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে কবিতা বার হ'ল; এবার কাঠকয়লা দিয়ে—

রামযশ ফাঁকতালে বগল বাজায়
ক্যাশবাক্সে বউ পুরে কলিকাতা যায়।

এবার কিন্তু ছেলেদের শাসন করবার জন্য আর রামানন্দী নোটিস বার হল না। কেমন যেন নিস্পৃহ গোছের হয়ে গেছেন এনজিনসার চাকরি সম্পর্কিত সমস্ত কাজকর্মে; ছাত্রদের শাসন সম্বন্ধে উদাসীন; স্কুলে আসতে হয় তাই আসেন; কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে চলে যান। আমরাও বড়দের কথার পুনরাবৃত্তি করি—"একটা কোন আঘাত পেয়েছেন, বুঝলি!"

সে সময় দেশে একটা স্বরাজের হুজুগ চলছিল। উনি কোন রাজনৈতিক কারণে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন কিনা সে কথা জানবার জন্য অনেক সি. আই. ডি. এসেছে এ শহরে, শুনলাম। আরও কত-রকমের কথা শোনা গেল। মাস ছয়েক পর তাঁর ইস্তফাপত্র উপর থেকে মঞ্জুর

হয়ে এলে এইসব জল্পনাকল্পনা বন্ধ হয়। কবি নিজের ভুল বুঝতে পেরে, পায়খানার দেওয়ালের কবিতাটা একটু বদলে দিল। ফাঁকতালে শব্দটা খাটে না আর।

রামযশ মহানন্দে বগল বাজায়,
ক্যাশবাক্সে বউ পুরে খুলনাতে যায় ;

তিনি চলে যাবার দিন আমরা সকলে স্টেশনে গিয়েছিলাম—কবি নরেশ পর্যন্ত। রহস্যেঘেরা যে অসূর্যম্পশ্যা মহিলাটিকে প্রতি শনিরবিবারে ঘরে বন্ধ থাকতে হয়, তাঁকে একবার এই সুযোগে দেখে নেবার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। মেয়েকামরায় চড়বার সময় তাঁর এত লম্বা ঘোমটা ছিল যে চেষ্টা করেও মুখখানা দেখা গেল না। আর সকলে যখন এনজিনসারকে নিয়ে ব্যস্ত, আমি তখন প্ল্যাটফর্মের দিকটা ছেড়ে গেলাম গাড়ীর পিছন দিকে। প্ল্যাটফর্মের দিকে পিছন ফিরে এনজিনসারের স্ত্রী বসে রয়েছেন। ঘোমটার বহর কমেছে। গালে পান। গিন্নী গিন্নী চেহারা। স্নেহের রসে ভরা করুণ চোখ দুটি। আমার দিকে নজর পড়তেই নমস্কার করলাম তাঁকে। থতমত খেয়ে গেলেন তিনি প্রথমটায়। তারপর বললেন, "বেঁচে থাকো বাবা!" চোখের কোণে কয়েকটি কুণ্ঠিত হাসির রেখা। আবার পিছন ফিরে বসবার আগে ঐ রেখাকয়টির মধ্যে দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিতে চাইলেন—"তোমরাতো আমার অবস্থা সব জানই।" মুহূর্তের জন্য একটা নিবিড় একাত্মতা অনুভব করলাম ওই অসহায়া মহিলাটির সঙ্গে। এঁকে নিয়ে ছড়া কাটবার নির্দয়তা উপলব্ধি করে, মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্কুলে ফিরে, কবির অনুমতি না নিয়ে, পায়খানার দেয়ালের কবিতাটিতে একটা সংশোধন করে দিলাম। বউ শব্দটির স্থানে বই।

রামযশ মহানন্দে বগল বাজায়
ক্যাশবাক্সে বই পুরে খুলনাতে যায়।

বিবেক একটু তৃপ্ত হ'ল বটে, কিন্তু অনুতাপের গ্লানি তবু গেল না।

ত্রিশ বছর পরে, আজ নরেশ কবিরাজ, শ্রীরামযশ ভট্টাচার্যের চিঠিখান পড়ে প্রথমেই যে কথাটি বলল, সেটি না বললে আমি হতাশ হতাম।

"এ যে দেখছি রামানন্দী নোটিস বাবা!"

"বল, এখন কি করা যায়।"

"আরে চেপে যা, দরকার কি এ-সব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে।"

"কিন্তু বিপদে পড়ে লিখেছেন ভদ্রলোক।"

"ও রামানন্দী আরও কত জায়গার কত গণ্যমান্য লোককে চিঠি ঝেড়েছেন, তার ঠিক কি!"

"তবু একটা উত্তর তো দিতে হয়।"

"তোর বাবার নামে চিঠি, সে চিঠির উত্তর দেবার তোর দায়িত্ব তো নেই।"

নরেশের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেও কিন্তু কোন ফল হ'ল না। চিঠির উত্তর না দিলে কি হয়, এনজিনসার ছাড়বার পাত্র নন। মাস তিনেক পর, একদিন দেখি বাক্সপেটরা সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ এসে হাজির আমার বাড়ীতে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। এই পঁচাত্তর বছর বয়সেও দেখলাম বৃদ্ধ বেশ শক্ত আছেন। সে তুলনায় তাঁর স্ত্রীকে আরও বেশী বুড়ী বলে মনে হয়। সঙ্কোচকাতর, ত্রস্ত চাউনি বৃদ্ধার। এনজিনসার এসে আমার নাম ধরেই ডেকেছিলেন; এর থেকে বুঝি যে স্টেশন থেকে আসবার পথে সব খবর নিয়ে এসেছেন। "তোমার পিতার নামে একখান চিঠি দিয়েছিলাম মাস তিনেক আগে।"

কথার সুরে জবাবদিহি নেবার ইচ্ছা স্পষ্ট। তার উপর 'পিতা' শব্দটির ব্যবহার। সাবধান হয়ে গেলাম।

"সে চিঠি পাইনিতো।"

"আমিও সেই রকমই ভেবেছিলাম। পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টটাতেই পচ ধরেছে। কলমটা দাও দেখি তোমার। পোস্টমাস্টার-জেনারেলের কাছে একখান কড়া চিঠি দিয়ে দিই।"

"আচ্ছা সে হবে এখন।"

"হবে মানে? ওই করে করেই তো তোমরা দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে!"

বুঝলাম যে ওঁর মেজাজ আগেকার চেয়েও রুক্ষ হয়েছে। কাগজ-কলম তখনই ওঁর হাতে দিয়ে তবে রক্ষে। ওঁর স্ত্রী ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে বাড়ির ভিতর পৌঁছে দিয়ে এসে বসলাম এনজিনসারের কাছে।

তাঁরা মাসখানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসেছেন। এতদিন ছিলেন কলকাতার এক রেফিউজী ক্যাম্পে। সেখানে বিশেষ সুবিধা হ'ল না। তাই এখানে এসেছেন। গল্প করতে করতে হঠাৎ মধ্যে একবার মুখখিস্তি করে তাড়া দিয়ে উঠলেন আমার কম্পাউণ্ডারবাবুকে। ওঁর সঙ্গে আনা প্যাকিং বাক্সের উপর সে পা রেখেছিল অন্যমনস্কভাবে। ধরে মারেন আর কি, ওই বাক্সটির উদ্দেশে চোখ বুঁজে প্রণাম করে আবার তিনি নিজের কথা বলতে আরম্ভ করেন। এই অনর্গল গল্প শেষ হ'ল রাত্রে শুতে যাবার সময়। "নাও। এইটা রেখে দিও তো। সেখানকার সব বেচে, মাত্র এই দু'হাজার টাকাই তো আনতে পেরেছি।"

আমি নোটের বাণ্ডিলটা নিয়ে নিজের ঘরে যাব, তিনি আবার তাড়া দিয়ে উঠলেন,—"এত বয়স হ'ল, তবু আক্কেল হল না তোমাদের! টাকা কখনও না গুণে নিতে আছে! Principle হচ্ছে principle—সে তোমার বাপই হোক, আর গুরুঠাকুরই হোক!"

মন খারাপ হয়ে গেল। এই বদমেজাজী, রূঢ়ভাষী অতিথির অত্যাচার কতদিন যে সহ্য করতে হবে কে জানে! সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হবে! এর চেয়ে বরঞ্চ যদি মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে

রেহাই পাওয়া যেত তা'হলে ছিল ভাল। এমন শরণার্থী যে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে একটা সৎকাজ করবার তৃপ্তিটুকুও পাওয়া যায় না!

অপ্রসন্ন চিত্ত নিয়েই গিয়েছিলাম নরেশের কাছে।

"এনজিনসার এসেছে! বলিস কি! ক্যাশবাক্সটা এনেছে? দেখিস নি? সে বুড়ীর বয়স কত হবেরে এখন? সত্তর হবে? ঘোমটার বহর? বুড়ো বলল নাকি যে ওই বয়সের মেয়েছেলেদের নিয়েও আর থাকবার উপায় নেই সেদেশে? ধানের জমি আর নারকোল সুপুরির বাগান ক'শ বিঘা বলল? যে আসে তারই মুখে শুনি ওই! আরে, পূর্ববঙ্গে কি তিন'শ বিঘার কম জমি কোন লোকের থাকত নারে! কথাবার্তা সেই রকমই উগ্রবীর্যের মত আছে নাকি? তার চেয়েও বেড়েছে! বলিস কি! বিদায় করে দে, বিদায় করে দে যত তাড়াতাড়ি পারিস! নইলে কোনদিন তোকেই ঠেঙ্গিয়ে বসবে! কি করতে চান তিনি এখানে এই বয়সে? সে সব জিজ্ঞাসা করিস নি! কি রে তুই! এই বয়সে স্কুলমাস্টারি করতে কি আর পারবে? প্রাইভেট টুইশানি করতে পারে হয়'ত। কিন্তু খুনেটার হাতে কে তার ছেলেমেয়েকে ছেড়ে দেবে বল। পুরুতগিরি ও তো করবে না নিশ্চয়ই—রামানন্দী যে। রাত্রিতে শুনিস তো আজ, এখনও এনজিনের শব্দ করে কি না! রিলিফ-টিলিফ পাবার তদ্বির একটু করে দিলেই হবে, যত তাড়াতাড়ি পারিস বাড়ি থেকে বিদায় কর।"

নরেশ তো উপদেশ দিয়েই খালাস। কিন্তু এনজিনসার যাবার নামও করেন না। ভবিষ্যতে কি করতে চান, সে সম্বন্ধেও কোন আভাস দেন না। ডিসপেনসারির মধ্যে বসে সারাদিন কোষ্ঠী, ঠিকুজি, সামুদ্রিক-বিদ্যা, আর হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে গল্প করেন অনর্গল, আমার রুগীদের সঙ্গে। তাকে থামাবার জন্য একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, হাতের রেখা দেখে কি সত্যিই লোকের ভবিষ্যৎ বলা যায়?"

ভেবেছিলাম চটে উঠবেন, কিন্তু দেখলাম যে আমার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। চকিতের জন্য যেন বিষাদের ছায়া পড়ল তাঁর চোখমুখে। বললেন, “আমার নিজের যা ধারণা—ভাল জ্যোতিষীদের কথাও সম্পূর্ণ ফলে না আজকাল। ফলে ধর—এই—শতকরা সত্তর ভাগ—সেভেন্টি পারসেন্ট। জ্যোতিষীদের দোষ নেই; তারা তো বইটই ঘেঁটেই বলবে; তার থেকে ওই সেভেন্টি পারসেন্ট-এর উপরে ফল পাওয়া যায় না। তোমার কাছে তো আর মিথ্যা কথা বলতে পারি না। এ শাস্ত্রের কোন বই পড়তে বাদ রাখিনি। সেকালের মুনিঋষিরা লিখে গিয়েছিলেন সব ঠিকই—আমরাই বোধহয় মানে বুঝতে ভুল করে, হিসাবে একটু এদিকওদিক করে ফেলি। সে সব আমাদেরই অজ্ঞানতা। তাই কিছু-কিছু অংশ ফলে না। তবে তোমরা—আজকালকার ছেলেছোকরার দল—যারা জ্যোতিষশাস্ত্রে অবিশ্বাস কর—তাদের বলি—আগে শাস্ত্রটা পড়ে দেখ, তারপর বিচার করতে বস। একজন ভণ্ড মূর্খ কাকে কি হাত দেখে বলেছে, আর সেইটা মেলেনি ব'লে তো আর একটা শাস্ত্রকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি যদি পড়তে চাও তো আমার ওই দু'টো প্যাকিংবাক্সে ভরা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই আছে; পড়ে দেখতে পার। শুধু ওইগুলোই তো আনতে পেরেছি পাকিস্তান থেকে। তোমার পড়ায় আমি সাহায্যও করতে পারি।”…একটা বাড়ি থেকে রুগী দেখবার জন্য ডাকতে আসায়, আমি তখনকার মত রক্ষা পাই।

এনজিনসারের স্ত্রী কিন্তু দেখলাম অন্য ধরনের মানুষ। প্রাথমিক সঙ্কোচটুকু কাটবার পর বোঝা গেল তিনি কত ভাল। কি মিষ্টি কথা। একেবারে আপন করে নেওয়া ব্যবহার। স্বামীর আচরণে সব সময় একটু কুণ্ঠিত ভাব। স্ত্রীর দেখাদেখি আমিও তাঁকে মাসিমা বলতে আরম্ভ করলাম। রেঁধে খাওয়ানো, ছেলেমেয়েদের রূপকথা শোনানো,

হাসি, গল্প,—ইনি একেবারে অন্য মানুষ। শুধু এনজিনসারের খড়মের শব্দ শুনলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যান।

ভদ্রমহিলা যত ভালই হ'ন, বর্তমান ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না। ভয় হতে লাগল, এনজিনসারের কল্যাণে আমার রুগী না হাতছাড়া হয়ে যেতে আরম্ভ করে। একদিন একজন দাঁতের ব্যথার রুগীকে ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বোঝালেন যে, গার্গী ব'লে কেউ ছিলেন না— গর্গমুনির লেখা পুঁথিগুলোর নামই গার্গী। সেই রাত্রিতেই চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ওঁকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলাম—"এরকম ভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না।"

"সে তো নিশ্চয়ই।"

"ছেলে পড়াবেন?"

"ও দিকে আবার আমি যাই!"

"পৌরোহিত্য?"

"খেপেছ!"

"তবে? একটা কিছু করতে তো হয়।"

"সে তো করবই। তুমি কি ভেবেছ যে তোমার ভরসাতেই আমি ঘরবাড়ি ছেড়ে এতদূর এসেছি!"

"না না, সে কথা কি আমি বলছি। আমি বলছি, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি আমরা, আপনার কাজে।"...

"ছাই করবে তোমরা! দাও না বড় রাস্তার র একটা ছোট বাড়ি যোগাড় করে। খুব তো ফপরদালালি করছ!"

দোকান দেবেন নাকি?"

"পাগল!"

"এখন বাড়ি পাওয়া শক্ত। দু' তিন বছর আগে কত বাড়ি খালি হয়েছিল। আপনি যদি ঘর-দুয়োর ছেড়ে আসাই ঠিক করলেন, তবে

এ দু'তিন বছর দেরী করলেন কেন? দেশ ভাগ হওয়ার সময়ই চলে এলেন না কেন?"

"আমার সময় হবে, তবে তো আমি আসবো!"

কথাটা ঠিক বুঝলাম না। তবু বলতেই হ'ল—"তা' তো বটেই।"

শেষ পর্যন্ত খুলেই বললেন। তিনি জ্যোতিষীর কাজ করতে চান। কলকাতায় বসলেই ঠিক হ'ত; কিন্তু সেখানকার বাসাভাড়া তাঁর মত লোকের পক্ষে জোটানো সম্ভব নয়; তাই পিছিয়ে গিয়েছেন সে সঙ্কল্প থেকে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আসা।

নিজের গরজে, সরকারী মহলে তদ্বির করে এনজিনসারের জন্য একটা ছোট বাড়ি যোগাড় করা গেল। আগে এটা ছিল পশমী [illegible] আলোয়ানের দোকান। আলমারিতে বই, তক্তাপোশে শীতলপাটি, আর কুলুঙ্গিতে ধুনুচি দিয়ে ঘর সাজান হ'ল। পাঞ্জাবী শালওয়ালাটা চলে গেছে পাকিস্তানে; কিন্তু তা'র জীর্ণ সাইনবোর্ডখানা তখনো দেওয়ালে টাঙান ছিল। সেইটাতে নূতন করে রং দিয়ে লেখা হ'ল, রাজজ্যোতিষী শ্রীরামযশ ভট্টাচার্য। 'রামানন্দী নোটিস' ছাপিয়ে আমার ডিস্‌পেন্‌সারির টেবিলের উপর গাদা করে রাখা হ'ল, রুগীদের মধ্যে বিতরণের জন্য। আমি শুধু বলেছিলাম, "ইংরাজীতে হ্যাণ্ডবিল দিয়ে লাভ কি?" সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর পেয়েছিলাম "পয়সাটা খরচ হচ্ছে আমার, না তোমার? আমার নিজস্ব ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে আস কেন বল তো!"

তবু তারপরও আমি যথাসাধ্য করে [illegible] ওই পরিবারটির জন্য। সে কেবল ওই মৃদুভাষিণী বৃদ্ধাটির কথা মনে করে। আমার স্ত্রী মাসিমা বলতে পাগল; ছেলেমেয়েরা একদিন দিদিমার দেখা না পেলে হাঁপিয়ে ওঠে। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে যেত খুব সকাল-সকাল। তারপরই তিনি চলে আসতেন আমাদের বাড়ীতে, প্রত্যহ। মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "কি, ছেলের খাওয়া এখনও হয়নি?"

আমার খেতে-খেতে দুটো বেজে যেত। তিনি পাখা হাতে করে খাওয়ার কাছে বসতেন। তারপর হামানদিস্তায় ছেঁচা পান মুখে দিয়ে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প-গুজব করে, বেলা চারটের সময় ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে আসবার পর, বাড়ি ফিরতেন। এ তাঁর নিয়মিত কাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিকুজী কোষ্ঠী তৈয়ারী করে এই ছোট শহরে কত আর রোজগার করা যায়; তার উপর ওই মেজাজ। সেইজন্য আমার স্ত্রী নানা রকমে জিনিসপত্র দিয়ে মাসিমার অভাবের সংসারে সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন। মাঝে-মাঝে অর্থ সাহায্যও করতে হ'ত—অবশ্য রাজজ্যোতিষীকে লুকিয়ে।

আমার মত নরেশও ঠিকুজি কোষ্ঠীর ধার ধারে না। তার মেয়ের যেখানে বিয়ের কথা হচ্ছে, তা'রা ঠিকুজি চেয়ে পাঠিয়েছে—পাত্রটি ভাল—হাতছাড়া না হয়ে যায়—আমিই বললাম—"রাজজ্যোতিষীকে দিয়ে করিয়ে নিলে কেমন হয়। বৃদ্ধার বড় অভাব। এই সুযোগে তাঁকে দু'চার টাকা বেশীই দিয়ে দিতে পারিস। মেয়ের দেবগণ হ'লে যে কোন ছেলের কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে যাবে।"

নরেশ ইতস্তত করছিল। শেষ পর্যন্ত আমার কথাতে গেল। রাজজ্যোতিষীকে প্রণাম করে, যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর একখানি দশ টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে শীতলপাটির উপর রাখে।

"কি উদ্দেশ্যে?"

"আজ্ঞে, একখান ঠিকুজি তয়ের করে দিতে হবে।"

"কার?"

"আমার বড় মেয়েটির।"

"বিবাহ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ বেশ। কোষ্ঠী না মিলিয়ে কখনও বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

জন্মপত্রিকা না মিলিয়ে বিবাহ করে, আমি নিজে ভুগেছি সারাজীবন। কি অশান্তিই যে গিয়েছে চুয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। মেয়ের জন্মের সময়টা লিখে এনেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দয়া করে একখান দেবগণওয়ালা কোষ্ঠী তয়ের করে দেবেন সার।"

আর যাবে কোথায়! এত বড় ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবার পাত্র এনজিনসার নন।

"কি! এত বড় কথা! আমাকে মিথ্যা জন্মপত্রিকা তয়ের করে দিতে বলছ। টাকা দেখাতে এসেছ!" নোটখানাকে নিয়ে, টেনে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে তিনি ফেলে দিলেন মেঝের উপর।

"যাও! নিকাল যাও! আভী নিকালো!

অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে তিনি নরেশকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। লোক জমে গেল সেখানে।

এনজিনসারের স্ত্রী ছুটে এলেন আমার কাছে। চোখে জল। এত বিহ্বল তাঁকে আমি কখনও দেখিনি।

"আমারই হয়েছে মরণ! একেবারে জ্বলে পুড়ে ম'লাম এক পাগলের হাতে পড়ে! এর চেয়ে মা-বাপ গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেয়নি কেন! নিজে যা সহ্য করেছি সারা জীবন সে কেবল আমিই জানি—আর জানেন অন্তর্যামী। কিন্তু লোকের কাছে যে মুখ দেখানো ভার। অত বড় একজন লোক—নরেশ কবরেজ—তাঁকে বুড়ো কি গালাগালিটাই না করল! আমি না হয় জানি, পাগল; লোকে তা বুঝবে কেন। কত সময় ভেবেছি আত্মহত্যা করি; তা'ও করিনি ওই পাগলের জন্যে। পাগল কি সোজা পাগল! দেশের বাড়ীতে গ্রামসুদ্ধ সবাই ওকে জানত বদ্ধপাগল বলে। এখান থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাবার পর খেয়াল হ'ল শাক-সবজির বাগান করব—

নিজহাতে। বেশ তো কর না—কে বারণ করছে। প্রথমে গিয়েই পশ্চিমের নারকোল বাগানটা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হলো। পাড়ার মাথারা এসে কত বোঝালেন—নারকোল গাছের মধ্যে কি শাক-সবজি ফলে—তার চেয়ে বাড়ির পিছনে খালি জমিটুকু ঘিরে তাতেই তরকারির বাগান কর। কে কার কথা শোনে—আমি ওই নারকোল বাগানের মধ্যেই তরকারি ফলিয়ে দেখাব। দেখাও! পৃথিবীর আর সবাই বোকা, যত বুদ্ধি সব ভগবান দিয়েছেন ওরই মাথার মধ্যে পুরে! মুখ থেকে একবার যে কথাটা বার হবে, সেটার কি নড়চড় হবার জো আছে! নিজহাতে বাগান করব মানে সত্যিকারের নিজহাতে—নিজে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে বাগান করা—নিজে শাবল দিয়ে এক কোমর করে গর্ত করে তার থেকে ইটপাটকেল বাছা—সব নিজ হাতে। পারবে কেন? ওসব কোনদিন অভ্যাস থাকলে তো পারবে। ফললো হয় তো দুগাছ সরু-সরু ডাঁটা। তারই পিছনে কি মেহনত। যে সব মাসে রোদ্দুরের তেজ বেশী, সে সব মাসে বাগান কোপাতে যেত রাত্রিতে। সাপখোপের সময়। আমি ভয়ে মরি। জপতপ সব গেল বুড়োর; কেবল বাগান আর বাগান। পাগল আর কাকে বলে। না হয় দু'টো লোকই রাখ। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সে কথা তোলে ওই পাগলের কাছে। আমাকে তো জিজ্ঞাসা করে না কোন কথা কোনদিন—করতে জানে শুধু হুকুম। মুখ থেকে হুকুমটা বার করতে যেটুকু দেরী; তারপর এই দাসীবাঁদী তো হাজিরই রয়েছে। পান থেকে চুন খসলে। শুধু কি ধমক আর রাগারাগি! মার পর্যন্ত খেয়েছি। সে কি একদিন দু'দিন। কতদিন। থাকগে—সে সব কি অপরের কাছে বলবার মত কথা! কাকে দোষ দেবো—দোষ আমার কপালের। ওর চোখের দিকে আমি কোন দিন তাকাতে পারি না ভয়ে—এই বুঝি চোখ রাঙিয়ে চীৎকার করে ওঠে!...নিজে থেকেই দু'চার বছর বাগান করবার পর

খেয়াল হ'ল যে তরকারির জমির সব রস নারকোলগাছে টেনে নিচ্ছে। এর ওষুধ কি হ'ল জান? তখনই হুকুম হয়ে গেল নারকোল গাছ কাটবার। আহা রে! দু'শটা ফলন্ত নারকোলগাছ! তারপর মনের মত তরকারির বাগান হ'ল। ওইখানেই করা চাই। বদ্ধ পাগল! একবার নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে ছেলের দল এসেছিল শশা চুরি করতে—ও বুঝি তখন বাগানে কাজ করছিল—অন্ধকারে কোদাল ছুঁড়ে একটা ছেলেকে এমন মেরেছিল যে খুনের দায়ে পড়বার যোগাড়। পাড়ার লোকে সেবার বুড়োকে মারধরও করেছিল। করবেই তো। সবাই তো আর আমার মত কেনা বাঁদী না! তবু ভাল যে চিরকালই লোকজনের সঙ্গে আমার দেখাশোনা কম। এখানে এসে পাবার মধ্যে তো পেয়েছি তোমাদের। তাও আমার অষ্টপ্রহর ভয় যে তোমাদের সঙ্গেও একটা দুর্ব্যবহার করে না বসে। অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়! তুমি বাবা, একটু নরেশ কবরেজকে বুঝিয়ে বলো, তিনি যেন আজকের অপমানের কথাটা মনে করে না রাখেন। আমি যে তাঁর সম্মুখে বার হই না, নইলে আমি নিজেই যেতাম তাঁর কাছে! বোলো যে বুড়ো পাগল—একটা পাগলের কথায় কি রাগ করতে আছে। সে পাগলের আর কি,—আমারই মুখ দেখানো ভার!"···দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে মাসিমার। কি বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবো, ঠিক করতে না পেরে, আমরা চুপ করে থাকি।

দেখা হ'তে, নরেশ কিন্তু ভাব দেখাল যেন কিছুই হয়নি। আমার মনে হ'ল যেন সে ইচ্ছা করেই অতটা হাসিখুশী ভাব দেখানর চেষ্টা করছে। যেতেই কবিতা আওড়াল,

> "এতদিনে জানলেম
> বউকে যে বাঁধলেম
> তালা দিয়ে রাখলেম
> সে কিসের জন্য,

হাত গোনা গোষ্ঠীর
গরমিল কোষ্ঠীর
জন্য রে জন্য।

চুয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত এই বিপদ ছিল বুড়োর।" হো হো করে হেসে সে বুঝিয়ে দিল যে, এনজিনসার আজ ভুলে এই কথাটা স্বীকার করে ফেলেছে তার কাছে।

নরেশের কবিতা লিখবার ক্ষমতা দেখে আমি চিরদিন অবাক হয়েছি ; কিন্তু তার রুচির প্রশংসা কোনদিন করতে পারি। এনজিনসারকে নিয়ে ছড়া কাটবার সময়, সে তাঁর স্ত্রীর নাম ওর মধ্যে টেনে আনবেই আনবে! সে বেচারী কি দোষ করেছে! সেই পায়খানার দেওয়ালের ছড়াগুলো থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কোনটাতেই সে সেই অসহায়া মহিলাটিকে রেহাই দেয়নি। কিন্তু একথা আজ নরেশকে বলার সাহস নেই আমার। আমার কথাতেই সে রাজ-জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিল ঠিকুজি করাতে। আজকের অঘটনের জন্যে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। তাই নরেশের মন যুগিয়ে কথা বলতে হ'ল।

"জানিস, রাজজ্যোতিষী একদিন আমার কাছেও আর একটা কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আজকালকার সবচেয়ে ভাল জ্যোতিষীর গণনারও মাত্র সত্তর পারসেণ্ট সত্যি হয়।"

"তাই বলেছে নাকি? তা'হলে আমি বলছি, তুই লিখে রাখ—ওর ধারণা যে ওর স্ত্রী ওই ত্রিশ পারসেণ্ট-এর মধ্যে পড়েছে। ও ধরে নিয়েছে যে ওর স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে গণনাটা ভুল। তা আজকাল নিরাপদ মনে করে তোদের বাড়িতে যখন-তখন আসতে দিচ্ছে।"

নরেশের ঘর কাঁপানো হাসির মধ্যে আমার মৃদু আপত্তি কোথায় তলিয়ে গেল।

"এমন এক একটা কবিরাজী গুলি তুই থেকে-থেকে বার করিস!"

"শোন্ শোন! ছড়া শোন।

খড়িপাতা গণনার আহা মরি ছিরি সে
গিন্নীকে ফেলেছেন শতকরা তিরিশে।"

"তুই কবির দল খুললি না কেন রে?"

"কবির দল খুললাম না কি আর সাধে! যে লোকটা আমার বাঁধা গান সংশোধন করে দিত, সে দেখলাম ডাক্তার হয়ে গেল। মনের দুঃখে আমাকে হ'তে হলো কবিরাজ।"

এই আবহাওয়ার মধ্যে মাসিমার অনুরোধের কথাটা আর তুলতে পারলাম না নরেশের কাছে সেদিন।

এর কিছুকাল পর, একদিন বেলা গোটাদশেকের সময়, বাজারে হইচই শোনা গেল। কম্পাউণ্ডার খবর দিল রাজজ্যোতিষীর বাড়িতে পুলিসের গাড়ি এসে থেমেছে। সঙ্গে আছে শালওয়ালাটা।

"কোন শালওয়ালা?"

"রজব আলি, পাঞ্জাবী—ওই যে, যে আগে থাকত ঐ বাড়িতে। বাড়িটাড়ি খালি করাবে বোধ হয়।"

"কেন আবার ফিরে আসবে নাকি পাকিস্তান থেকে?"

"শালওয়ালার পুরনো সাইনবোর্ডটা রাজজ্যোতিষী রঙচঙ করে বদলে নিয়েছে। সেই সংক্রান্ত কিছু নয়ত? তুমি একবার দৌড়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এস না, কি ব্যাপার।"

কম্পাউণ্ডার ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পরে। ব্যাপার কিছুই বোঝা গেল না। পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। অফিসারদের সঙ্গে শালওয়ালা বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে। বহুক্ষণ হয়ে গেল, বাইরে বার হবার নাম নেই।

আছেন ; কিন্তু তাঁরা তো নিজেদের ঢাক পিটিয়ে বেড়ান না। Ful many a gem of purest ray serene…আচ্ছা এখানে serenest লিখল না কেন বলতো? Purest যখন রয়েছে, তখন ওটা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত serenest !"...

অবান্তর কথা আসায়, বুঝি যে ওঁর কাজের কথা শেষ হয়েছে। আবার এখনই কাগজ-কলম না চেয়ে বসেন বিলাতের পণ্ডিতদের কাছে চিঠি লিখবার জন্য !

"আপনার স্নানাহার হয়েছে ?"

"না। আজ আর সে সময় পাওয়া গেল কোথায়। এতক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই ভাতেভাত চড়িয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, চলি। অনেক বেলা হয়েছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন ; আর দেরি করবেন না। মাসিমার রান্না হয় তো এতক্ষণে হয়ে গিয়েছে।"

"তুমি আবার আসছ কোথায় ?"

"একবার দেখে আসি, কেমন মেঝে-টেঝে খুঁড়ে পুলিশে তছনছ করেছে ঘর।"

"না না !"

গলার স্বরে চমকে উঠলাম। রাগ আর বিরক্তি সে স্বরে সুস্পষ্ট। হন-হন করে চলে গেলেন তিনি।

আমার স্ত্রী দেখলাম খিড়কির দরজা দিয়ে উঠোনে ঢুকছেন ; হাতে পাথরের বাটিতে কি যেন ঢাকা।

'মাসিমাকে দেবার জন্য একটু দই নিয়ে গিয়েছিলাম ; দেখলাম দরজায় তালা দেওয়া। আমাদের বাড়ি ছাড়া আর তো উনি কোথাও যান না ! এরই মধ্যে বেরিয়ে গেলেন কোথায় ?"

কি আর জবাব দেবো। কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাবন্ধ করে

রাখে, আমরা তার কি করতে পারি ! কোনও অধিকার নেই আমাদের। বৃদ্ধের উপর একটা রুদ্ধ আক্রোশে মন বিষিয়ে উঠল।

নরেশকে গিয়ে সব বললাম।

সে জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁ রে, রাজজ্যোতিষী কথাটার মানে কিরে ? রাজাদের জ্যোতিষী, না জ্যোতিষীদের রাজা ?"

"কে জানে ! ইনি কিন্তু রামজ্যোতিষী বাবা !"

"যা বলেছিস। কিন্তু শুনে রাখ।

চড়ুই পাখীরা সবে করে কানাকানি

জ্যোতিষীর রাজ নি[illegible] হবে টানাটানি।"

ঠিক বুঝলাম না কথাটার মানে।

"বুঝলি না ? কি রে তুই ! অত খুলে বললে কি কবিতার রস থাকে ? আজ থেকে রাজজ্যোতিষী আবার আগেকার মত রাত্রিতেও জেগে পাহারা দিতে আরম্ভ করবে না কি রে ? শোন তবে খুলেই বলি—

মইয়ে-চ[illegible] অধীনের ভাব দেখি ছবি,

আজ রাতে কবিরাজ হবে রাজকবি॥

এই প্রৌঢ় বয়সেও নরেশ তাই করে ছাড়ল। এবার পায়খানার দেওয়ালে নয়, রাজজ্যোতিষীর সাইনবোর্ডে ; বাঁ হাত দিয়ে নয়, ডান হাত দিয়ে ; কাঠকয়লা দিয়ে নয়, আলকাতরা দিয়ে। পরদিন সকালে দেখা গেল, 'রাজ'-এর জায়গায় 'রাম' লিখে সে আমার কথাপ্রসঙ্গে বলা সংশোধন মেনে নিয়েছে। সাইনবোর্ডের পাশের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা প্ল্যাকার্ড আঁটা। তাতে বড়-বড় [illegible]ক্ষরে লেখা—

রামানন্দী নোটিস (বাংলায়)

রামযশ, রামানন্দী, হেডমাস্টার,

তারপরে হয়েছিল এনজিনসার।

রাজজ্যোতিষীর পর বাকি কত আর,
অষ্টোত্তরশত নাম মানিল যে হার।
দেখ নামের কি বাহার॥

এর পর তর্জনী-সঙ্কেতে দেখানো, সাইনবোর্ডের 'রামজ্যোতিষী' শব্দটি।

ইচ্ছা হলো ওর হাতখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই। সত্যিই রাজকবি হবার যোগ্য। আমার আনন্দ যে আজকের ছড়াটির মধ্যে সে মাসিমার নাম টেনে আনেনি। এতদিনে বুঝি তাঁর দুঃখে ওরও প্রাণ কেঁদেছে!

মুনাফা ঠাকরুণ

ফণী ইংরাজী বাংলা লিখত ভাল। বাসনা ছিল কাগজ চালাবে ভবিষ্যতে। কিন্তু নিতে হয়েছিল কাজ শেঠজীর গদিতে, মাসিক সত্তর টাকা মাইনেতে। তবে কাজটা নিজের লাইনের—অর্থাৎ লেখাপড়ার কাজ—ইংরাজী আর বাংলায় চিঠিপত্র লেখার কাজ। কলেজে পড়বার সময় সে পলিটিক্স করত। এখানে এসে দেখে যে গদির পরিবেশ আর মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ঠিক তার পলিটিক্সের জানা ছকে ফেলা যায় না।···চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নেই; ফরাসে বসে জলচৌকির উপর খাতা রেখে লিখতে হয়। সিঁদুর দিয়ে বড় বড় করে লেখা দেওয়ালের 'মুনাফা' শব্দটিকে ও কুলুঙ্গীর গণেশঠাকুরকে প্রধান কর্মচারী টিকমচাঁদ ধূপ-ধুনো দিয়ে প্রত্যহ পূজা করে; অন্য কর্মচারীরা ভক্তিভরে প্রণাম করে। গদির মধ্যে থুতু ফেলা বারণ নয়, কিন্তু চা খাওয়া বারণ। নামমাত্র মাইনেতে গদির এতগুলি কর্মচারী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে; কিন্তু কেউ মাইনে বাড়াবার দাবি করে না। একই ধরনের কাজ করে কেউ কম মাইনে পায়, কেউ বেশী; তবু তা নিয়ে কোন আন্দোলন নেই। অন্দরমহলের আচার, বড়ি, পাঁপর, শেঠগৃহিণীর সঙ্গে আধাআধি বখরায় গদির কর্মচারীরা লুকিয়ে বিক্রি করে দেন। অদ্ভুত!···মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে যায়, এদের ধরন-ধারন দেখে!···

একদিন বলেই ফেলল। সকালে গদিতে ঢুকেই শোনে যে অন্য কর্মচারীরা কালকের হঠাৎ ফাটকা দরটা নেমে যাবার কথা আলোচনা করছে। ফণীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"এক মিনিটও সময় নষ্ট নেই বাবা! যেন এই প্রেমের গল্পটুকু না করতে পেরে রাত্রিতে ঘুম হয়নি ভাল করে! মাসকাবারে মাইনে পাই; ফাটকার দরে আমার আপনার দরকার কি মশাই? সে বুঝুক গিয়ে মালিকরা।"

এই মন্তব্যটা থেকেই বাদানুবাদ আরম্ভ। নির্দোষ হাসিঠাট্টা থেকে অকারণে গরম গরম কথা এসে গেল। গদির লোকরা 'ফণী' উচ্চারণ করতে পারে না, বলে ফাণী। আজ ফণী তাদের জিভের ডগায় আরও খানিকটা বেশী করে, ঘি আর লঙ্কা মালিশ করতে উপদেশ দিল—উচ্চারণ ঠিক করবার জন্য। তারা মিস্টার ফাণীর প্যাণ্টালুন আর থার্মফ্ল্যাস্ক নিয়ে ঠাট্টা করে; ফণী তাদের পাল্টা উপদেশ দেয় আরও একটু জবজবে করে মাথায় তেল মাখতে;—তা হলে যদি এক ওই মরুভূমি ভরা মগজগুলো, টাকার ঝনঝনানি ছাড়া, আর অন্য কোন আওয়াজে সাড়া দেয়!...

এই বিমুখ মুহূর্তে গদিতে এসে প্রবেশ করলেন শেঠজী।

প্রথমে দেয়ালের 'মুনাফা' কথাটাকে, তারপর কুলুঙ্গীর গণেশঠাকুরকে চোখ বুঁজে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। এরপর তিনি তাকালেন ঘড়িটার দিকে।—"জয় গণেশ! এখনও তোমরা কাজ আরম্ভ করনি? পনর মিনিট কাজে ফাঁকি দিলে, গদির লোকসান কত হয়, তার হিসাব রাখো?"

সকলে নিরুত্তর।

"গদি হল মন্দিরের মত জায়গা। এখানে এসব ঝগড়াঝাঁটি কেন? দেখি টিকমচাঁদ, চিঠিপত্র কি সব এসেছে। সে রকম জরুরী কিছু নেই তো? বাংলা ইংরাজী চিঠিগুলোই আগে দাও। কোথায়, ও মিস্টার

ফাণী! পড়তো এগুলো। বছরে আটশ' চল্লিশ ...
দই তোমাকে; তবু তোমার কাজে মন নেই!" শেঠজীর মুখে 'মিস্টার ফাণী' শুনে, কর্মচারীদের চোখে চোখে হাসি খেলে যায়। দেখে ফণীর মাথা গরম হয়ে ওঠে।

"মাইনে দিচ্ছেন বলে কি যা ইচ্ছে তাই বলবেন! কর্মচারীকে তুমি না বলে আপনি বলা যায় না? এদিকে নিজের ছেলেকে তো বিরিজলালবাবু বলে ডাকা হয়। বছরে আটশ' চল্লিশ টাকা দেখাতে এসেছেন? অমন টাকা …!"

টিকমচাঁদ হাঁ হাঁ করে ছুটে এল।

"করছেন কি ফাণীবাবু। নিমক খেলে তার দামও দিতে হয়।"

"যথেষ্ট হয়েছে। আপনি থামুন তো! মাসে সত্তর টাকার নিমকের দাম, আমি তিল তিল করে দিচ্ছি দু বছর ধরে। দিন আট ঘণ্টা করে এই মুনাফাদেবীর মন্দিরে বসে কাটানর মজুরিই সত্তর টাকার চাইতে বেশী। আপনার মাসিক ছিয়াশি টাকার নিমকের দাম, আপনি হুজুরের মাথার পাকাচুল তুলে, হুজুরের খয়নির থুতু চেটে, হুজুরের 'মুনাফা'তে ধূপ-ধুনো দিয়ে, যেমন করে ইচ্ছে শোধ করুন না কেন। অন্যর ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে আসেন?"

ছোট মুখে বড় কথা! কয়েকজন আমলা এগিয়ে এল বেয়াদব ফাণীটার জিভ ছিঁড়ে নেবার জন্য। অসীম আত্মপ্রত্যয় আর প্রশান্তির দ্যুতি শেঠজীর মুখচোখে।

"যাও! তোমরা সকলে নিজের নিজের কাজ করোগে যাও! কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে মিস্টার ফাণীর—তোমাদের কী এর মধ্যে? হাঁ, শোন মিস্টার ফাণী, নিজের দর নিজে ফেললে সব সময় ভুল হয়। লোকের দর ফেলবার মালিকানী হচ্ছেন ওই মুনাফা ঠাকরুণ। খুব করেন উনি। ঠাকুর দেবতার কাছে একচোখোমি নেই। তবে

আমি বুঝতে পারছি যে তোমার এখানে অসুবিধা। এই নাও তিন মাসের মাইনে। পেণ্টুলুন পরে চেয়ারে বসবার চাকরি তোমার যেন কোথাও জুটে যায়! জয় গণেশ! জয় গণেশ!"

মুহূর্তের জন্য ফণী হতভম্ব হয়ে যায়। সে এতটা ভাবেনি। তারপর তার মুখে খই ফুটতে আরম্ভ করে।

"সব জয় গণেশ আমি বার করছি! তোমার গদির ওই গণেশকে আমি উল্টে ছাড়ব। লালবাতি দেখেছ, লালবাতি? তোমার দেয়ালের ওই মুনাফা ঠাকরুণকে আমি লোকসান ঠাকুর করিয়ে ছাড়ব! ভেবেছ কি! তোমার গদির নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা; সব আমি ফাঁস করব! হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আমি। ফণী চাটুজ্যেকে চেন না।"···

শেঠজী মনে মনে হাসলেন—গণেশ উল্টোবার কথা বলে ভয় দেখায় ছোকরা—জানে না যে আসল গণেশ থাকেন বাড়ির ভিতর—ইনি তো গদির গণেশ—কতবার উলটোন কতবার বসেন মুনাফা ঠাকরুণকে কসরৎ দেখানর আনন্দে, তার কি ঠিক আছে!···

এর মাস কয়েক পরের কথা। অন্দর মহলের আসল গণেশঠাকুর আর দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুণকে প্রণাম সেরে, গাদতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন শেঠজী, হঠাৎ নীচে মোটর-হর্ণ-এর শব্দ শোনা গেল।

···বিরজুর গাড়ি না? এই তো খানিক আগে নিজের গদিতে যাবে বলে বেরুল। এখনই ফিরে এল?···

শেঠ-গিন্নী দোতলার জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখলেন।···হ্যাঁ বিরজুইতো। কিছু ফেলে-টেলে গিয়েছিল নাকি? হাতে দেখছি একখান বই—রঙীন ছবিওয়ালা মলাট। নিশ্চয়ই বউমার হুকুম ছিল যে এখনই চাই—তাই দিতে এসেছেন বইখান। কি ছাঁদেরই যে

বউ হয়েছে! ফরমাশের উপর ফরমাশ চলছে বিরজুর উপর অষ্ট প্রহর! দাই ঠিকই বলে—দিন রাত্রি ফুসলানী দেয় বউ বিরজুকে আলাদা হবার জন্য। ছেলেরও লক্ষণ ভাল না। দেখছি তো। মা বাপকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ওই দেখনা—বউএর জন্য আনা বইখান মা বাপকে একটু লুকিয়েও তো আনতে পারত।...ও দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুণ! রোজ তোমাতে ঠেকিয়ে একটা করে আধলা আমি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসি; আচার তয়ের করবার আগে তেল দিয়ে হাঁড়ির উপর তোমার অক্ষর মূর্তি এঁকে নিই; হিঙের বড়ি দেবার আগে ছোট ছোট বড়ি সাজিয়ে তোমারই দেবকলেবর লিখে নিই; তবু কেন ঠাকরুণ আমার এমন রোজগেরে ছেলেকে লোকসানের খাতায় ফেলতে দিচ্ছ! কেন একটা পরের বাড়ীর মেয়েকে দিয়ে এমন লাখপতি ছেলেকে বেহাত হয়ে যেতে দিচ্ছ!"

বিরিজলাল ঘরে এসে ঢুকল গম্ভীর হয়ে। বইখানাকে লুকোতে ভুলে গিয়েছে ছেলে—বউমার জন্য কেনা বই—ছেলে লজ্জা পেতে পারে ভেবে শেঠজী সেদিকে তাকান না।

"কি বাবা বিরজু, শরীর খারাপ হয় নি তো?"

"না।"

"কোন লোকসানের খবর নয় তো?"

"না।"

"নতুন কোন সরকারী কানুন হ'ল নাকি?"

"না।"

"ইনকামট্যাক্স?"

"না।"

"তবে?"

"বইখানা কিনে তোমাকে দেখাতে এলাম।"

"বই! আমার জন্য ?"

অবাক হয়ে তাকালেন শেঠজী ছেলের দিকে।…খবরের কাগজে তবু না হয় বাজারদর আর নতুন কানুনের খবর থাকে। কিন্তু বই তিনি কি করবেন ?…

…বইখানা তাহ'লে বউমার জন্য কেনা নয়।…বিরজুর মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, বইখান স্বামীর হাত থেকে নিলেন।

…বাঃ, মলাটের ছবিটা ভারী মজার তো! একজন পাগড়ি বাঁধা, মেরজাইপরা লোক জাঁতা ঘোরাচ্ছে; জাঁতায় দেওয়া হচ্ছে মানুষের কঙ্কাল, আর তার থেকে বেরিয়ে আসছে টাকাকড়ি, সোনারূপো!…

"ওমা! লোকটার মুখে তোর বাপের মুখের আদল আসে—তাই না বিরজু?" শেঠজী ছবিটার দিকে তাকালেন—লোকটার নাক গণেশজীর মত লম্বা, সম্মুখের দাঁত দুটোও প্রায় তাই। এর সঙ্গে বিরজুর মা তাঁর মিল দেখল কোনখানে? যেমন নিজের চেহারা তেমনি তো দেখবে অন্যকে!…

এতক্ষণে বিরিজলাল কথা বলল। আজ সকালে বেরিয়েই দেখে যে পথের মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজওয়ালারা তার বাবার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে—"শেঠজীর কেচ্ছা! শেঠজীর কেচ্ছা! দাম দু টাকা! দাম দু টাকা!" বইগুলোর কি বিক্রি! পড়তে পাচ্ছেনা। সেও একখান কিনে নেড়েচেড়ে দেখে। ইন্দ্রাণী পাবলিশার্স নামের একটা রদ্দী বইয়ের দোকান "হাটে হাঁড়ি" নামের একটা সিরিজ বার করছে। এখানা সেই সিরিজের প্রথম বই। বিরিজলাল তখনই যায় তার মামা ফেকমলের গদিতে। একটা মোটর-ট্রাকে করে বাজারের সব বইগুলো কিনে আনবার জন্য ফেকমলকে পাঠায়। নিজে তো যেতে পারে না—তাহলে যে বাপের ছেলে বলে সবাই চিনে ফেলবে! মামা কিছুক্ষণের মধ্যেই বইগুলোকে নিয়ে আসবে।…

শেঠজীর মুখের শান্তভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হলনা।

"এবার কিনে না হয় পুড়িয়ে ফেললে। কিন্তু তারপর? আবার যে ওরা ছাপবে? কতটাকা পুঁজির লোক বইয়ের দোকানদাররা? এই লেখা থেকে কত ক্ষতি হতে পারে আমার, সেটা না জানলে, ঠিক করবে কি করে, যে কত টাকা আমরা ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সকে খাওয়াতে পারি! বিরজুর মা, তুমি চট করে গিয়ে জাঁতার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখ। ফেকমল বইগুলো নিয়ে এলে ওই ঘরে রাখতে হবে। তারপর খানকয়েক খানকয়েক করে রোজ রান্নাঘরের উননে পুড়িয়ে ফেলো।"

গিন্নীকে কোন রকমে এখান থেকে বিদায় করে, তারপর শেঠজী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন। "হ্যাঁরে বিরজু, বইখানাতে আমার সব লিখেছে নাকি?"

"সব কি আর লিখতে পেরেছে?"

"বইখানাকে ভাল করে পড়ে, আন্দাজ কত টাকার খারাপ বলেছে, সেইটা একবার হিসাব করে নিয়ে আয়।"

বিরিজলাল চটে উঠল—"এখনও হিসাব? যত টাকা খরচ হয়, ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সকে একবার দেখে নেব! মানহানির মোকদ্দমা আনব তাদের বিরুদ্ধে। পুলিসকে টাকা খাইয়ে আমি ওদের জেরবার করব। বজ্জাত ফণীটার পিছনে আমি গুণ্ডা লাগাব। ভেবেছে কি ওরা!"

"মাথা গরম করিস না বিরজু।"

ধীর পদক্ষেপে শেঠজী বার হলেন গদিতে যাবার জন্য।

সেই সন্ধ্যায়, বিরিজলাল গিয়েছে ফণীর সঙ্গে দেখা করতে। শেঠজীর ঘরে, শালা ভগ্নীপতিতে সলাপরামর্শ চলছে।

ফেকমলের মতে ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সদের কারবারটা কিনে, সেটাতে তালা দিয়ে রাখাই হ'ল সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এরই স্বপক্ষে ও

বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোর আলোচনা চলছে। হঠাৎ কথার মধ্যে শেঠজী জিজ্ঞাসা করলেন শালাকে—"আজ কত লাগল, বইগুলো কিনতে?" ফেকমল এর জন্য তৈরী ছিল। এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেল —"দু হাজার সাতশ আটত্রিশ টাকা সাড়ে ন আনা। ষোলশ' আটানব্বই খান বই দু টাকা করে; কুড়ি টাকা ট্রাক ভাড়া; দু টাকা সাড়ে ন আনা কুলি ; পাইকারী রেটে কেনা ব'লে কমিশন পাওয়া গিয়েছে শতকরা কুড়ি টাকা করে।"

শেঠজীকে ঠকাবার ক্ষমতা নেই কোন শালার। তিনি ফোনে জেনে নিয়েছেন আজ যে, বেশী বই নিলে শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাওয়া যাবে। কথাটার ইসারা দিতেই শালার সুর বদলালো।

"মারো গোলি! যেতে দাও! একশ টাকা কমই দিও। আমি না হয় বুঝব যে ভগ্নীপতির জন্য শতকরা পাঁচ টাকা করে, ঘর থেকে খরচ করলাম।"

শেঠজী চোখ টিপে রসিকতা করলেন—"শালা কোথাকার! আচ্ছা আমি এখন একবার উঠি। তুমি ততক্ষণ তোমার দিদির সঙ্গে একটু লাভ লোকসানের গল্প কর। আমি একবার চট্ করে গদি থেকে তোমার পাওনা টাকাটা নিয়ে আসি। সেখানে টিকমচাঁদকে বসিয়ে রেখেঁ এসেছি।"

"তার এখনই কী দরকার ছিল। বাড়ীর লোকের সঙ্গে আবার…"

"না না, এসব ব্যাপারে নগদ নারায়ণ হয়ে যাওয়াই ভাল। জয় গণেশ! জয় গণেশ!"

শেঠজী চলে গেলে শেঠ-গিন্নী মুখ খুললেন। "গ্যাখ ফেক্না, তুই নিজেকে বড় বেশী চালাক মনে করিস—না? আমার বাপের বংশের মাথা হেঁট হবে বলে, আমি বিরজুর বাপের সম্মুখে কথাটা বলিনি।

তুই হিসাব দিলি ষোলশ আটানব্বই খানা বই কিনেছিস; আমি গুণে দেখছি মোটে তের শ দশখান আছে।"

ফেকমল দিদির পা জড়িয়ে ধরে—একথা যেন ভগ্নীপতিকে বলা না হয়—বাকি বইগুলোর লাভের উপর সে আধাআধি বখরা দিতে রাজী দিদিকে।

ফেকন চলে ডালে ডালে তো দিদি চলেন পাতায় পাতায়। দিদি সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গিয়েছেন যে কাল থেকে এ বইগুলোর বাজারদর চড়বে; লোকে যখন দেখবে যে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন দু টাকার বই পাঁচ টাকা দিয়েও কিনতে পারে। শেষ পর্যন্ত রফা হল, বই পিছু এক টাকা করে তিনি পাবেন।...তোর ধর্ম তোর কাছে ফেকনা। মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকাস না যেন!...

তারপর তিনি গলা নামিয়ে, ছোট ভাইকে আর একটা রোজগারের রাস্তা বাতলাতে পারেন বললেন—মোটেই গোলমেলে না—শীতকালে তো জলের মত সোজা—জাঁতার ঘরের বইগুলো উননে না ফেলে, খানকয়েক খানকয়েক করে প্রত্যহ আলোয়ানের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া—এই টুকুতো কাজ।...

ফেকমল দিদির কাছে সত্যিই শিশু—দিদি যদি বেটাছেলে হত, তা হলে লাটসাহেব কিংবা ইনকামট্যাক্সের হাকিম পর্যন্ত হয়ে যেতে পারত বোধহয়।...কিন্তু ধরা পড়লে যে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে!...আজ থাক, দিদি। দিদি আশ্বাস দিলেন—"আলোয়ানের মধ্যে করে বই নিয়ে যাওয়া আবার একটা শক্ত কাজ নাকি? ছেলেবেলায় ঠাকুরদাকে দেখেছি, বাজরা ওজন করবার সময়, খদ্দেরের চোখের সম্মুখে সেরে পোয়া সাফ্। তুই বোধহয় তখন জন্মাসওনি। কিন্তু বাবা যখন গুটগুটিয়াদের গদিতে বছরে বাহাত্তর টাকা মাইনেতে চাকরি করতেন, সেই সময়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোর? সে সময় আটা আর ডাল

কোন দিন পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়েছে আমাদের ? গ্রীষ্মকালেও না। সেই ছেগমলের নাতি, লেখমলের ছেলে তুই ! গায়ে আলোয়ান থাকতেও পাবি ভয় ? ছি ! ছি ! ছেলেমানুষেরও অধম তুই ! এই নে !"

কুলুঙ্গীর গণেশ ঠাকুরের পিছনের স্তূপীকৃত ফুল সরিয়ে খানকয়েক বই বার করলেন।...প্রণাম গণেশজী ! প্রণাম মুনাফা ঠাকরুণ ! ফেকনের উপর দৃষ্টি রেখো ! ও নেহাত ছেলে মানুষ !...দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুণের দেবাক্ষরা কলেবরে বইগুলো ঠেকিয়ে, তিনি দিলেন ফেকমলের হাতে।

লেখমল-বংশের গৌরবময় ঐতিহ্য আটা ডাল নিয়ে; ছাপা-লেখা নিয়ে নয়। তাই ফেকমলের বুক দুরদুর করে।

"দেখতো দিদি, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না তো ?"

"না না ! ভয়েই ম'ল ! তোর আলোয়ানটা কি কাঁচের, যে বাইরে থেকে দেখা যাবে বইগুলো !"

বাইরে চেঁচামেচি শোনা গেল। ঝিরিজলাল হাত ধরে টানতে টানতে টিকমচাঁদকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে।

"চোর কোথাকার ! আজ আমি মেরে হাড়গুঁড়ো করব তোর ! বাবার পেয়ারের পায়রার দেখ কাণ্ড ! দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখি যে, এই ধম্মপুত্তুরের বাচ্চা আলোয়ানের নীচে খানকয়েক বই নিয়ে বার হচ্ছেন। যত সব চোরের আড্ডা হয়েছে বাবার গদিটা ! বাবা কোথায় মা ?"

"এই তো, এখনই গেল গদিতে।"

"গদিতে ! গদিতে তো নেই ! আমি তো সেখান থেকেই আসছি।"

"এই ফেকনা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? এদের গদির লোক নিয়ে ব্যাপার—ওরা বাপবেটায় যা মন চায় করবে টিকমচাঁদকে, তোর এর মধ্যে কি ? যা, বাড়ি যা !"

"না না মামা, তুমি যেওনা। আগে এ বদমাশটাকে ঠাণ্ডা করে নিতে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

এই শীতের মধ্যেও ফেকমলের কপাল তখন ঘেমে উঠেছে।

বিরিজলালের হাতের এক চড় খেয়েই টিকমচাঁদ পরিত্রাহি চিৎকার করতে আরম্ভ করে—"ও শেঠজী শীগগির আসুন—এরা আমায় মেরে ফেললে।"...

নীচে থেকে শেঠজী সাড়া দিলেন। বোঝা গেল যে তিনি বাড়িতেই আছেন। আসছেন। এসে, দেখেশুনে অবাক! কি ব্যাপার? ছেলে বুঝিয়ে দিল—"বাজারে বইয়ের দর এবেলা চারটাকা হয়েছে। সেই খবর পেয়ে আপনার পেয়ারের টিকমচাঁদ দশখান বই সরাচ্ছিলেন।"

আরও দুচার ঘা পড়তেই টিকমচাঁদ সব বলে ফেলল—তার কোন দোষ নেই—শেঠজী নিজে তাকে ওই বইগুলো দিয়েছিলেন জাঁতার ঘর থেকে, বাজারে বিক্রি করবার জন্য—চার টাকা দরে। ··প্রত্যহ খানকয়েক করে দেবেন বলেছিলেন। বিরিজলাল বাবুকে আসতে দেখে শেঠজী জাঁতার ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন।...

এরপর আর টিকমচাঁদকে কিছু বলা চলেনা। সে চলে গেল। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শেঠজী হুঙ্কার দিলেন—"কেন? নিজের বাড়ীর জাঁতাঘরে ঢুকতে হলেও কি আমায় টিকিট কেটে ঢুকতে হবে নাকি? আমি জাঁতার ঘরে চুরি করতে যাইনি—বই গুনতে ঢুকেছিলাম।" শেষের কথাটা বলবার সময় অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানলেন শ্যালকের দিকে ফেকমলের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে; তার দিদিরও।

বিরিজলালের এখন আর এসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানর সময় নেই। সে খবর দিল যে ইন্দ্রাণী পাবলিশার্স সে পঁচিশ হাজার টাকায় কিনবে ঠিক করে এসেছে। হাজার ত্রিশেক টাকা দিয়ে আর

একটা ভাল প্রেস কিনবে। মাসে মাসে 'হাটে হাঁড়ি' সিরিজের বই বার করবে, ইংরাজী, হিন্দী, আর বাংলায়। ছাপার অক্ষরের কারবারে, পয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জত আছে। মিস্টার ফাণীর সঙ্গেও, সে সব ঠিক করে এসেছে। ছাপা অক্ষরের ব্যবসাতে ওই রকম পেণ্টুলুন-পরা লোকেরই দরকার। এতো আর রামে রাম, দুয়ে দু নয়। এ হচ্ছে ছাপার অক্ষরের ব্যবসা। চেয়ার টেবিলে বসবে, বন্ধুদের নিয়ে চা সিগারেট ওড়াবে, এই হচ্ছে এ ব্যবসার রীত।...

শেঠগৃহিণী ছেলের এই নূতন ব্যবসা খুলবার সঙ্কল্পের মধ্যে বউমার ফুসলানীর গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু প্রশান্ত আনন্দে ভরে উঠেছে শেঠজীর মুখ, ছেলের ব্যবসায়িক বুদ্ধি দেখে। পারবে। এ ছেলে পারবে বাপের নাম রাখতে! সব চেয়ে আনন্দ যে এই রকম একটা নতুন অজানা ব্যবসাতে তাঁকে টাকা ঢালতে হবে না। ঢালবে বিরজু, তার নিজের টাকা থেকে।...

ও মহামহিম ছেগমলের বংশধর, আলোয়ানের মধ্যে ডান হাতখানা তোমার যে অবশ হয়ে এল। আর কষ্ট করবার দরকার কি! ও সাতখান বই গণেশ ঠাকুরের ফুলের নীচে আমি আগেই দেখেছিলাম।"

নিজের নিজের কাজের জন্য কেউই অপ্রস্তুত নয়। এ সবই মুনাফা ঠাকরুণের রাজ্যের নিয়মের মধ্যে পড়ে। তবু বিরজুর মা কথা পালটাবার জন্য দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুণকে প্রণাম জানাতে জানাতে বললেন "যাঁর কৃপায় এত বড় লোকসানটা বদলে লাভের কারবার হয়ে গেল, তাঁর দেবাক্ষরা কলেবর, আজই আমি সেকরা ডেকে রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো।"

এবার মুনাফা ঠাকরুণ ফণীর দর ফেললেন মাসে একশ পঞ্চাশ টাকা। সে যে রকম করিতকর্মা লোক তাতে মনে হয় যে দেবীর অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠতে তার আর বেশী দেরি নেই।

তবে কি…!

অ্যাঁ! সার্জেণ্টমেজর মারা গেল? কিসে ম'ল? এইতো পরশু না তরশুও দেখলাম রবার্টসনের মেয়ের পাশে মোটরগাড়িতে ব'সে? দিনকয়েক থেকেই লক্ষ্য করছিলাম যে, তার বরাত ফিরেছে—তার স্ত্রী আবার তাকে পাশে বসিয়ে অষ্টপ্রহর খুব গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি…!

…একটি রুগ্ন পাণ্ডুর মুখ…বালিশের উপর ছড়ান কাঁচা পাকা মেশানো চুলগুলি…বেদনা ও অনুযোগে ভরা দুটি নীল চোখ।

মিসিজ পেরী মারা যাবার পর আজ প্রথম তার কথা মনে পড়ল।

সার্জেণ্টমেজরের মৃত্যুসংবাদ শুনে মিসিজ পেরীর চোখদুটির কথা মনে পড়াটা খুব স্বাভাবিক জিনিস হয় তো নয়। মনের গভীরে এই দুটো জিনিসের মধ্যে কোন একটা যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে। নইলে এমন-ভাবে এমন সময় ছবিটা চোখের সম্মুখে ভেসে উঠবে কেন? হঠাৎ মনে পড়া তো আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

এখানকার কারও কাছে সেসব কথা বলার সাহস আমার নেই; আপনাদের কাছে বলেই বলছি। এক নাটকীয় মুহূর্তে তিনজোড়া চোখের আয়নায় আমি যা দেখেছিলাম, তা যদি আপনারা দেখতেন,

তাহলে আপনারাও নিশ্চয় সার্জেণ্টমেজরের মৃত্যুসংবাদ শুনেই প্রশ্ন করতেন—'কিসে ম'ল?' আমারই মত, আপনাদের মনেও মুহূর্তের জন্য একটা সন্দেহের ঝিলিক খেলে যেত—'তবে কি...!'

না; সন্দেহ শব্দটা বোধহয় ঠিক হল না ওর মধ্যে। যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরবার একটা ভাব আছে। সংশয় কথাটার মধ্যেও যেন মনের উপর একটা কড়া বুরুশের ঘষটানি লাগবার ভাব মেশানো। তার তুলনায়, মনের উপর আমার 'তবে কি'র পরশ অনেক হাল্কা—অনিশ্চয়তা অনেক বেশী—ভিত অনেক পলকা। সংশয়ের আভাস মাত্র লেগেছিল আমার মনে।

তিনটি চাউনির ক্ষীণদীপিকায় দেখা তিনটি মনের জগৎ স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে, তাদের আগেকার কথা খানিকটা জানা দরকার।

যদিও আমাদের কথা আরম্ভ হয়েছে সার্জেণ্টমেজর ও মিসিজ পেরী, এই দুজন পরলোকগত ব্যক্তিকে দিয়ে, কিন্তু আমাদের আসল কাহিনী দুজন জীবিত ব্যক্তিকে নিয়ে। পেরী সাহেব আর রবার্টসনের মেয়ে। এখানকার দুটি বনেদী নীলকর পরিবারের বংশধর এরা।

পেরী সাহেবরা ছিল এ-জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক। শোনা যেত, বর্ষাকালে ছাতাপড়া নোটের বাণ্ডিল ওরা রৌদ্রে শুকোতে দিত। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার আস্তাবল তাদের ছিল কলকাতায়। ঘোড়ার ঘাস পর্যন্ত নাকি তারা আনাত অস্ট্রেলিয়া থেকে। আমার একজন দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন পেরী সাহেবের কাছারির খাজাঞ্চী। তাঁর কাছ থেকে আমরা ছোটবেলায় পেরীদের, রূপকথার মত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতাম।

পেরী—ছ' ফুটের উপর লম্বা—বিরাট চেহারা—বিশাল চওড়া বুক—হাত, পা, আঙুল, কান, সবই যেন প্রমাণ সাইজের চেয়েও একটু বেশী বড়। ছোট শুধু স্লেটের রঙের চোখ দুটো আর বোঁচা নাকটা। লাল

টকটকে রং, চাঁদের মত গোল মুখ, ফোলা ফোলা গাল,—মোটকথা মুখশ্রী মোটেই সুন্দর নয়। আর এত চুল লোকটার সর্বাঙ্গে—কাঁধে, গলায়, হাতের পিঠে, কানের উপর, নাকের গোড়ায়—সব জায়গায় সমান ঘন। একটু বনমানুষ বনমানুষ ভাব। এই কারণেই অনেকে ওর মুখখানাতে একটা বন্য হিংস্রতার সন্ধান পায়। এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে বহুদিন। আমার শুধু মনে হত চেহারাটা হাবা হাবা গোছের। অত বড় চেহারার যেন একটা ছোট ছেলে। তাই সে অমন জেদী, একগুঁয়ে, উদ্ধত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন। যখনই যে খেলনাটার কথা মনে হবে তখনই সেটাকে চাই, নইলে রেগে আগুন হয়ে উঠবে। ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় তাকে পাশ কাটিয়ে কেউ এগিয়ে যাক তো! দপ করে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠবে। তখন আর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নিজের সামর্থ্য, অধিকার, ঔচিত্য, কোন প্রশ্নই তখন তার মনে আসে না। লোকটা তার শত্রু—আর কিছু মনে রাখবার দরকার নেই। চোখের সম্মুখের জিনিস ছাড়া আর কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই তার কাছে—ঠিক জন্তু জানোয়ারের মত।

ছেলেমানুষ ব'লে ছেলেমানুষ! আমার সেই আত্মীয়ের কাছে শোনা যে, কুঠি থেকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বা'র হবার আগে, সাহেব এসে ঢুকত কাছারিবাড়িতে। যেখানে খাজাঞ্চীবাবু টাকা পয়সা আনি দুয়ানিগুলো থাকে থাকে সাজিয়ে বসতেন, সেখানে গিয়ে ওই বুড়োখোকা পা দিয়ে সেগুলোকে প্রত্যহ একবার চতুর্দিকে ছিটিয়ে ফেলে দিত। কাতলা মাছের মত মুখের হাসিতে ফুটে বার হত সফল রসিকতা করবার বাহাদুরি।

তার ছেলেমানুষী আচরণগুলোর মধ্যে একটা বন্যভাব ছিল ঠিকই। সকলেই জানে যে, সে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিকারী; কিন্তু তাই ব'লে বাবুর্চির হাতের চায়ের পেয়ালায় রিভলবারের নিশানা পরখ করা,

বেশ একটু মাত্রাধিক্য নয় কি? মাচার উপর থেকে সে বাঘ মারেনি কোনদিন। বলত যে অমনভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঘ শিকার করবে মেয়েমানুষে!

যেমন ছিল তার বুকের পাটা, তেমনি ছিল তার হাতের অব্যর্থ নিশানা। ঘোড়া-পাগল সাহেবটা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে, তার পিঠের উপর থেকে বুনো হাঁস মারত।

এইসব কারণে লাটসাহেবের শিকার-পার্টিতে তার স্থান বাঁধা ছিল।

এই গেল পেরী সাহেবের পরিচয়।

বিচিত্ররূপিণী রবার্টসনের মেয়ের ভাবভঙ্গী অন্য রকমের। উড়ে বেড়ায়, নিজের খেয়ালখুশিতে, নাচুনী মেয়েটা। কথা বলবার সময়, কটা কটা চোখ দুটি থেকে হাসির দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। নতুন নতুন কাণ্ড ক'রে, এখানকার লোকদের রসের খোরাক জোগায় ত্রিসন্ধ্যা। তার মধ্যে একটা বললেই সে মেয়ের স্বভাবের ধরন খানিকটা বুঝতে পারবেন। ওদের জমিদারীর কুলের জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়েছিল একজন লোক, লাক্ষার জন্য। সেই লোকটা এক রাত্রিতে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একটা চিতাবাঘ মেরেছিল। মরা বাঘটার উপর বসে, লাঠিহাতে সেই লোকটাকে পিছনে দাঁড় করিয়ে রবার্টসনের মেয়ে পরের দিন ফটো তোলায়। তাকে নিয়ে এসে কুঠিতে রাখে। দিনকতক খুব মাথামাখি সে লোকটার সঙ্গে। তারপর একদিন তার সঙ্গে উধাও।

তখনও তামাকখোর বুড়ো রবার্টসন বেঁচে। কিছুকাল পর কোথা থেকে যেন বাপ ধরে এনেছিল মেয়েটাকে। দিনকয়েক একটু চুপচাপ; তারপর আবার যে কে সে-ই।

একবার এই রকম একটা ভাবোন্মত্ততার ঝোঁকে পড়ে সে নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলেছিল পেরীর সঙ্গে। পেরী গিয়েছিল, কমিশনার সাহেবের সঙ্গে, নেপালের রিজার্ভ ফরেস্টে গণ্ডার শিকার করতে।

গণ্ডারদের প্রেম নাকি একনাগাড়ে অনেকদিন চলে। সেই সময় গণ্ডার মারা নাকি শিকারীদের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ। কমিশনার সাহেবের হাতে মাত্র দুদিনের সময়, তিনি গণ্ডারের উপর গুলী চালিয়েছিলেন। আর যাবে কোথায়! বাঘের মত কমিশনার সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, পেরী তাঁর টুঁটি চেপে ধরে। দলের অন্য লোকরা মাঝে পড়ে কমিশনার সাহেবকে ছাড়িয়ে না নিলে, বোধহয় সেদিন তাঁর প্রাণটাই যেত। সরকারী মহল চাপা দেবার চেষ্টা করলেও, ঘটনাটার পল্লবিত বিবরণ দ্বিতীয় দিনেই আমাদের শহরে পৌছে যায়। নেপাল থেকে রাইফেল বন্দুকের বোঝা নিয়ে ফিরবার সময় পেরী দেখে যে রবার্টসনের মেয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। কমিশনার সাহেবঘটিত কাণ্ডটার সঠিক বিবরণ শুনবার অছিলায় সে এসেছে জগতের সেরা বীরকে প্রশংসাঞ্জলি দিতে।

অপ্রত্যাশিত! স্লেটের রঙের খুদে খুদে চোখ দুটোয় ফুটে উঠল বিস্ময়। সমাজের সবচেয়ে বাঞ্ছিতা সুন্দরী—যে এতদিন তাকে এড়িয়ে চলত, কাছে ঘেঁষতে দিত না—সে আজ নিজে যেচে তার কাছে ধরা দিতে এসেছে—হাতে ফুলের গোছা নিয়ে!

...তিনদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কর্কশ কণ্ঠস্বর, অমার্জিত কথাবার্তা, ষাঁড়ের মত চেহারা, উস্কখুস্ক চুল, ময়লা পোশাক, তামাক, হুইস্কি আর পচাঘামের উৎকট দুর্গন্ধ,—সব কদর্যতাগুলো মিলিয়ে একটা পৌরুষের জ্যোতিমণ্ডল সৃষ্ট হয়েছে পেরীর চারিদিকে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়; মন মাতিয়ে দেয়; সব গরব ঝিমিয়ে পড়ে। নিজেকে বিলিয়ে দেবার নেশা লাগে। ওই পুরুষ কাদামাখা বুট প'রে তার দেহকে মাড়িয়ে চলে যাক, হাতে চাবুক নিয়ে শপাং শপাং করে তাকে মারুক, ওই বনমানুষের মত হাতের দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে তার পাঁজরার হাড় ক'খান পাটকাঠির মত মট মট করে ভেঙে যাক!...

এই ভাবটা সাড়া জাগিয়েছিল রবার্টসনের মেয়ের দেহ-মনে। তারই ছোঁয়াচ লেগেছিল মেয়েটার কটা চোখের চাউনিতে। এত সূক্ষ্ম জিনিস পেরী সাহেবের মত জড়বুদ্ধি ও রসকষহীন লোকের নজরে পড়বার কথা নয়। তবু পড়ে গেল কি করে যেন; পূর্ণ স্বীকৃতি পেলে জড়বুদ্ধির পর্দাও বুঝি একটু ফাঁক হয়। কটা চোখের দ্যুতিটুকু একেবারে নতুন নতুন লাগল পেরী সাহেবের। দেশে-বিদেশে কত মেয়েই তো সে দেখেছে। লোক-ভোলানর জন্য ছুঁড়েমারা চোখের বিজুরী তো এ নয়। এ যে অন্যরকম। চোখের দীপ্তিটুকু যে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে! শুধু মুখে কেন—আকাঙ্ক্ষিতার সারা দেহে। চোখ ফিরনো যায় না সেদিক থেকে।...

শিশুর আনন্দ-উল্লাসের কয়েকটি রেখা নাকের নীচ আর চোখের কোণ থেকে বেরিয়ে ফোলা ফোলা গালের মেদের মধ্যে এসে হারিয়ে গেল। পেরীর মন চলে সিধে সড়কে—গলিঘুঁজির ধার ধারে না। সোজা হিসাবে একটা মানে করে নিয়ে, নিজের গাড়ি ফিরিয়ে দেয়। গিয়ে চড়ে বসে রবার্টসনের মেয়ের গাড়িতে।

"চলো মেমসাহেবকা কোঠি।"

কমিশনার-প্রহারের চাঞ্চল্যকর খবর চাপা পড়ে গেল পেরী সাহেবের আধুনিকতম কৃতিত্বে। দিনকয়েকের মধ্যে রবার্টসনের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল খুব জাঁকজমক করে। বিয়ের পর তারা চলে গেল হনিমুন করতে বিদেশে।

রবার্টসনের মেয়ে পেরীর স্ত্রী হবার পরও আমাদের কাছে কিন্তু রবার্টসনের-মেয়েই থেকে গিয়েছিল।

বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পরই সকলেই লক্ষ্য করে একটা বেসুরো ভাব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কত কানাঘুষো এ নিয়ে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে। বয়স্থা কুমারীরা মুখ টিপে হাসল।

যে লোকটা জীবনে কখনও দ্বিধা-কুণ্ঠার ধার ধারে না, স্ত্রীর কাছে তার কেমন কুণ্ঠাজড়িত ভাব! দাড়ি-না-কামানো অবস্থায়, ঘামের গন্ধওলা জামাটার কথা ভুলে গিয়ে, রবার্টসনের-মেয়ের সম্মুখে বার হবার সাহস তার আর নেই। পৃথিবীকে, পরিবেশকে বেপরোয়া তাচ্ছিল্য করবার সহজ দ্বিধাহীনতা তার গেল কোথায়? নিজের বেশভূষার উপর নজর পড়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা দোষী-দোষী ভাব মেশানো।

বীরভোগ্যা রবার্টসনের-মেয়ে চেয়েছিল পুরুষের মত পুরুষের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতে। কিন্তু বীরপুরুষের ছিবড়েও যে নেই এর মধ্যে! বীরপুরুষ না ছাই! ও জোরগলায় হুকুম করে না কেন? পান থেকে চুন খসলে চাবকে লাল করে দেবো—এই ভাষায় স্বামী কথা বলে না কেন তার সঙ্গে? সবচেয়ে অসহ্য পেরীর আজকালকার মিনমিনে ভাবটা।

রবার্টসনের-মেয়ে কিছুদিন চেষ্টা করে বাইরের সামাজিক সৌষ্ঠব বাঁচিয়ে চলতে। কিন্তু সে চেষ্টা বেশীদিন বজায় রাখা তার পক্ষে শক্ত। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া সে। মনের বাসনার সঙ্গে আপসে মিটমাট করতে শেখেনি কোনদিন রবার্টসনের-মেয়ে। আশাভঙ্গের স্থান নিল বিতৃষ্ণা; উদাসীনতার স্থানে এল তাচ্ছিল্য।

তারপর পড়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত। দরখাস্তে দেওয়া কারণটা এখানে বলবার মত নয়। পেরী সাহেব কোর্টে হাজির হল না লজ্জায়। রবার্টসনের-মেয়ের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল।

বেশ কিছুকাল পেরী সাহেবকে আর দেখা গেল না এখানে। সকলে বলল, লজ্জায় গা-ঢাকা দিয়েছে। পেরীসাহেবদের এস্টেটের বড় মেলা বসে এখানে প্রতি বছর। সেখানকার ঘোড়দৌড় আর হাতীর রেস

দেখবার জন্য আমরা ছোটবেলায় সারাবছর অপেক্ষা করে থাকতাম। সেবার প্রথম ঘোড়দৌড় আর হাতীর রেস বন্ধ থাকল। পেরী সাহেবের বিহনে শহর একেবারে কানা সে বছর।

সরস গল্পের অভাবে, সাঁঝের আড্ডার সিগারেট সবে বিস্বাদ লাগতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ শোনা গেল রবার্টসনের-মেয়ের নূতনতম প্রণয় নিবেদনের কথা। ঝিমিয়ে-পড়া শহর আবার জেগে ওঠে, পানসে গল্প আবার মিষ্টি হয়ে আসে। এবারকারটা 'পুলিস-লাইনস্'-এর সার্জেণ্ট-মেজরের সঙ্গে। শুধু প্রণয় নিবেদন নয়, শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল দুজনের। তখন নতুন এসেছে সার্জেণ্টমেজর। মিলিটারী ফেরত লোক; নাম ওব্রায়েন। সব সময় মদে চুর হয়ে থাকে। হাতে ছড়ি, মুখে সিগারেট, কোমরে রিভলবার, সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। যুদ্ধে কি করে সে মেডেল পেয়েছিল, একবার সে মিশর-সুদানে কেমন করে এক সঙ্গে দুটো সিংহ মেরেছিল, এই ধরণের গল্প সে সব সময় করে বেড়াত লোকের কাছে। একদিন মাতাল অবস্থায় আমার কাছে তার গায়ের কোট বিক্রি করতেও এসেছিল। এসব সত্ত্বেও আমরা তাকে অপছন্দ করতাম না; কারণ সে সাধারণ দেশী লোকদের সঙ্গেও প্রাণখোলাভাবে মিশত। এ জিনিস সে যুগে বিরল ছিল। আমরা বলতাম আইরিশম্যান কিনা—সেইজন্য। তাই এর সঙ্গে রবার্টসনের মেয়ের বিয়ে হওয়ায়, আমরা একরকম খুশীই হয়েছিলাম। যাক, এতদিনে একটা খাস বিলিতী লোক ধরেছে রবার্টসনের মেয়েটা—এই হল সাধারণ নাগরিকের মন্তব্য।

ওব্রায়েন সাহেব সার্জেণ্টমেজরের কাজ ছেড়ে দিল বিয়ের দিনই। আমাদের কাছে কিন্তু সার্জেণ্টমেজরই থেকে গেল, চিরকাল। রবার্টসনের মেয়ের নামও আমরা বদলালাম না, এ বিয়ের পরও। ও মেয়ের নাম একবার বদলালে আরও কতবার বদলাতে হবে, তার ঠিক কি!

বিয়ের পর দিনকতক সার্জেণ্টমেজরের সাইকেল চড়ে পাড়ায় পাড়া

ঘোরা বন্ধ হল। ঘুরত গাড়িতে, স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে। চেহারায়, পোষাকে একটু চাকচিক্য দেখা গেল। শনিবারে শনিবারে দার্জিলিঙ যায়।...যাবেই তো—অত বড়লোক ওর স্ত্রী। দেখ, ক'দিন টেঁকে ওর বরাতে। রবার্টসনের মেয়ে তো! চিতাবাঘ মারলে টেকে একমাস; কমিশনার মারলে টেঁকে এক বছর; জোড়া সিংহ মারলে কতদিন টিঁকবে? এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই অঙ্কটা আসবে নির্ঘাত, বুঝলি!...

দিনকতকের মধ্যেই লোকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবার লক্ষণ প্রকাশ পেল। আবার দেখা যায় সার্জেণ্টমেজরকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু পুরনো সাইকেলখানাতে নতুন রঙ পড়েছে। পকেটখরচ নিশ্চয়ই কিছু কিছু দেয় মেমসাহেব। আহা, বেচারা চাকরিটা হুট করে ছেড়ে দিল! হাজার হলেও আইরিশম্যান।

সার্জেণ্টমেজরের ভবিষ্যৎ ভেবে শহরের লোকের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। রবার্টসনের-মেয়ে কবে বিয়ে-বাতিলের দরখাস্ত দেবে আদালতে, লোকে তারই দিন গোনে। কিন্তু দেখা গেল, এ দিনগোনার শেষ নেই। আমরা হতাশ হলাম। বিজ্ঞরা চোখ টিপে মুচকি হেসে রায় দিলেন— "আছে। আছে। এর মধ্যেও তথ্য আছে। সেসব তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝবে না।" সে তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেলাম না আমরা। কেননা সেই সময় পেরীসাহেব ফিরে এল। একা নয়। নূতন মিসিজ পেরীকে সঙ্গে নিয়ে। নূতন স্ত্রী দেখতে সত্যিকারের সুন্দরী। টানাটানা নীল চোখ। না হেসে কথা বলতে পারে না। গভীর আত্মবিশ্বাসের ছাপ মুখের উপর। পেরী সাহেবের চেয়ে বয়সে অনেক বড়; তবে সেটা বেমানান লাগে না, দেখতে অত ভাল বলে।

নতুন স্ত্রীকে সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সে এসেই এমন রাজকীয় ঠাঁটে পার্টি দিল, যা এ মুল্লুকে এর আগে কেউ কোনদিন

দেখেনি। আমার সেই আত্মীয়ের মুখে শোনা যে, দেড় লক্ষ টাকা খরচ করেছিল সাহেব ওই একদিনের পার্টিতে। উদ্দেশ্য—রবার্টসনের মেয়েকে ছোট করা ; তার-সঙ্গে-বিয়ের সময়ের চেয়েও বেশী খরচ করা ; লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো, এ স্ত্রী আগের স্ত্রীর চেয়ে কত বেশী সুন্দরী। তার মত মেয়ের আমি কেয়ারও করি না।...

এর পর থেকে পেরী সাহেব টাকা ওড়াতে আরম্ভ করে খোলামকুচির মত। নিত্য নূতন ঘোড়া কেনার বাতিক জাগে। ব্যাঙ্গালোর, পুনা, বোম্বাই, লাহোর, সব জায়গায় ঘোড়া রাখে। স্ত্রীর বেশবিন্যাস দেখাশোনা করবার জন্য বিলাত থেকে একজন মেমসাহেবকে আনালো হাজার টাকা মাইনে দিয়ে। আর এই অনুপাতে অন্য সব খরচ। পেরী সাহেবের ঝোঁক তো! মিসিজ পেরীর কিন্তু কেউ কোনদিন নিন্দা করেনি। খুব ভাল লোক। স্বামীর স্বভাব যে একটা ছোট ছেলের মত, তা সে জানে। পেরী যখন স্বভাব অনুযায়ী, সামান্য কারণে রেগে আগুন হয়ে ওঠে, তখন সে মৃদু হেসে তার পিঠ চাপড়ে দেয়।

মিসিজ পেরী বোকা নয় ; কিন্তু স্বামী যে পরিমাণে খরচ করে সেই পরিমাণে বড়লোক কি না, সেকথা সে ধরতে পারে নি।

আমরাও পারি নি। কি করে কি হ'ল কে জানে। বোম্বাই-কলকাতার বহু পাওনাদার আস্তে আস্তে এখানে এসে জোটে ডিক্রি জারি করানর জন্য। তার মধ্যে একটা বিলাতী ব্যাঙ্কই সবচেয়ে বড় পাওনাদার। উকিল-ব্যারিস্টারের মরসুম পড়ে গেল। বহু রকমের মোকদ্দমা, বহু রকমের পাল্টা মামলা। পেরী সাহেব একেবারে জেরবার হয়ে গেল। এরই শেষের দিকের কথা। পেরী তখন হুডহীন, গদিহীন 'টি' মডেলের ফোর্ড গাড়িখানায় চ'ড়ে প্রত্যহ কোর্টে আসে, স্ত্রীর আদেশানুযায়ী মোকদ্দমার তদ্বির করতে। সার্জেণ্ট-মেজর তখন ভিড়ে গিয়েছে পাওনাদার ব্যাঙ্কের দিকে, টাকার লোভে। সে তাদের পক্ষ

থেকে মোকদ্দমার তদ্বির করে, ব্যারিস্টারের কাছে পেরীর বেনামী করা সম্পত্তির অন্ধিসন্ধি বাতলে দেয়, পাইপ-মুখে কোর্ট কম্পাউণ্ডে অযথা ব্যস্ততার ভান দেখায়, কলকাতার ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে ডাকবাঙলায় মদ খায়। বটতলায় খোলা গাড়িখানার মধ্যে বসে পেরী সব দেখে। এই অবস্থাতেও একটা নির্লিপ্ত বোকা বোকা ভাব; এত অভাবের মধ্যেও তার দুর্দিনের কথাটা পুরো বুঝতে পারছে কিনা সন্দেহ। মামলার নথিপত্র, আর উকিল-ব্যারিস্টারের অর্থহীন কথার ঝুড়ির নীচে, তার দুর্দৈবের স্বরূপটা কোথায় যেন তলিয়ে গিয়েছে। লেখাপড়া সে শেখেনি, আইনের মোটা মোটা বইগুলো দেখলে ভয় করে। অপর-পক্ষের ব্যারিস্টার তো তার শত্রু; তার সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার জন্য এসেছে; সার্জেন্টমেজর সেই ব্যারিস্টারেরই গুপ্তচর; দেখলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। বাড়ি থেকে বার হবার সময় স্ত্রী দুগালে দুটি নরম হাতের পরশ দিয়ে বলে দেয়—"দুষ্টু ছেলে! দেখো, কোর্টের মধ্যে কোন হইচই করে ব'স না যেন। লক্ষ্মীটি, আমার কথাটা মনে রেখ।" এই অনুরোধ মনে রেখেই সে পারতপক্ষে আদালতঘরে বা বারলাইব্রেরীতে বসে না। বসে থাকে ওই দূরের বটতলায়। দেখে, আর কত কি ভাবে।

একদিন একটা ফেঁকড়া মোকদ্দমায় তার স্ত্রী সাক্ষ্য দেবে। পেরী আর সেদিন বটতলায় বসে থাকতে পারল না। আদালতঘর লোকে লোকারণ্য। মিসিজ পেরী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবে; কলকাতার সাহেব-ব্যারিস্টার জেরায় তাকে নাজেহাল করবে; বহু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে-পুরুষও মজা দেখতে এসেছে। রবার্টসনের মেয়ে পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। মিসিজ পেরী সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। বড় রোগা রোগা দেখাচ্ছে। রঙ আগের চেয়ে ফ্যাকাশে হয়েছে। চোখ দুটো সেইরকমই নীল। গলার স্বর দৃঢ়। সাক্ষী বলল যে,

মোকদ্দমার বহু পূর্বে, বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে সে এই মীরপুরের জোতটা পায়।

বেশ বলছে, গুছিয়ে বলছে। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত!—পেরী সাহেব বিজয়ীর দৃষ্টি হানে উপস্থিত লোকদের দিকে—দৃষ্টি গিয়ে থামে শত্রুপক্ষের ব্যারিস্টারের মুখের উপর। এ কি! শত্রুপক্ষের দালাল, শয়তান সার্জেণ্টমেজরটা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল ব্যারিস্টার সাহেবকে কি যেন বলবার জন্য। বেশ জোরে জোরেই বলছে। "পেরী! পেরী করেছে বিয়ে! হেঃ! আমি রেকর্ড দেখাব। মিথ্যে কথা! এই মেয়েমানুষটা আদপেই পেরীর স্ত্রী নয়,—চালিয়েছে বিবাহিতা স্ত্রী বলে। এ ছিল কলকাতার একটা বাজারে মেয়েমানুষ। আমি রেকর্ড দেখাব আপনাকে ব্যারিস্টার সাহেব। বিয়েই হয়নি, সে আবার বিয়ের সময় সম্পত্তি পাবে কি করে?"

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। সারা পৃথিবী মুছে গিয়েছে তার চোখের সম্মুখ থেকে, শুধু ওই দুশমনটার মুখ ছাড়া। কুত্তীর বাচ্চা! পেরী ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার শত্রুর উপর। পিষে, থেঁতলে, কুটে সে ওই মুখখানাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। চেয়ার-বেঞ্চ ছিটকে পড়ছে চারিদিকে। গাউনপরা উকিল-ব্যারিস্টারের দল যে যেদিকে পারছে দূরে পালাবার চেষ্টা করছে। হাকিম গাম্ভীর্য ভুলে উঠে দাঁড়িয়ে—"আরদালী, আরদালী!" বলে চীৎকার করছেন; কিন্তু ঘরের তুমুল হট্টগোলের মধ্যে তাঁর কথায় কান দেবার মত লোক কোথায়? এই ঘটনাটার তীব্র আকস্মিকতায় অধিকাংশ লোক হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। এজলাস-ঘরের শান-বাঁধানো মেঝের ওপর পেরী সার্জেণ্ট-মেজরের মাথাটা ঠুকছে ঠক্ ঠক্ করে। কাছে যায় কার সাধ্য। মিসিজ পেরী সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে ছুটে গেল সেদিকে।

"ছি! বোকার মত অমন করে নাকি!"

ফণাতোলা সাপের মাথায় মন্ত্রৌষধি পড়েছে। মিসিজ পেরী স্বামীর হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লোকে পথ ছেড়ে দিল। বটতলার মোটরগাড়িখান ঝর ঝর শব্দ করে চলে যাবার পর মন্ত্রমুগ্ধা রবার্টসনের মেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেল; হাকিম গলা খাঁকার দিয়ে কোর্টের অস্তিত্ব জাহির করলেন; ব্যারিস্টার সাহেবের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল; উকিলবাবু অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে হাকিমকে মনে করিয়ে দিলেন যে, এই কাণ্ডটির জন্য পেরীর উপর কোর্টকে অসম্মান প্রদর্শন করবার মোকদ্দমা আনা উচিত।

এর ফলে পেরীকে মোটা টাকা জরিমানা দিতে হয় সেবার; কিন্তু যে লোকটা মার খেল, তার শাস্তি হল আরও বেশী। রবার্টসনের-মেয়ে স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া বন্ধ করে দিল সেই দিন থেকে। কাপুরুষেরও অধম! মিলিটারী মেডেল দেখাতে আসে!

এর পর থেকে সে বছরের মধ্যে আটমাস থাকতে আরম্ভ করে দার্জিলিঙএ।

মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে পেরী সাহেব পৈতৃক বসতবাটী ছেড়ে চলে যায়। এখানকার পরের রেলস্টেশনের কাছে, স্ত্রীর নামে রাখা একটা জমিতে ছোট্ট একটা খড়ের বাঙলা তয়ের করে সেইখানেই থাকত। সত্যি করেই সর্বস্বান্ত। নেবার মধ্যে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল তার বড় আদরের একদাঁতওলা বুড়ো হাতীটা, সবচেয়ে প্রিয় সাদা ঘোড়াটা, আর একরাশ দামী দামী বন্দুক-রাইফেল। স্ত্রী নিয়ে গিয়েছিল তার ট্রিক্‌সি নামের কুকুরটাকে।

পাওনাদাররা তবু ছাড়ে না। খুচরো মামলা-মোকদ্দমা তবু লেগে থাকে। পেরীর উকিল, মোক্তার বিনাপয়সার মক্কেলের মোকদ্দমায় যে রকম মনোযোগ দেওয়া স্বাভাবিক, ততটুকুই দেন। এত দুরবস্থার মধ্যেও পেরী সাহেব নির্বিকার। তালি দেওয়া প্যান্ট প'রে ঘোড়াটাকে

ডলাইমলাই করে ; বন্দুক নিয়ে পাখি শিকারে বার হয় ; নিজের পুরনো প্রজাদের ভয় দেখিয়ে, ঘোড়ার খাওয়ার দানা ও হাতীর জন্য কলাগাছ নিয়মিত আদায় করে। ভাবনা-চিন্তার বালাই সব স্ত্রীর হাতে স'পে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। স্ত্রী কি করে সংসার চালাচ্ছে, তার কাছে আগেকার জমানো কিছু টাকা আছে কি না, এসব কথা জানবার কৌতূহল কখনও তার মনেও আসে না। মিসিজ পেরীও সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের কথা তাকে বলে না।...ওকে ব'লে কি হবে। ও যে অসহায় ছোট-ছেলের মত। ওর অবস্থা কি ছিল, আর আজ কি হয়েছে। তাকান যায় না ওর দিকে। মায়া হয়। দুঃখ হয়। তবু ভাল যে, এই অবস্থা পরিবর্তনের কষ্টটা ভালভাবে বুঝবার মত বুদ্ধি ভগবান পেরীকে দেননি।...

তবু কখন কখন স্বামীকে বলতে হয়। কত সময় কত কাজে তাকে পাঠাতে হয়। অধিকাংশ সময়েই তাকে পাঠালে কোন কাজ হয় না ; তবু পাঠাতে হয়। পেরী শুনেই 'সিরিয়াস' হয়ে ওঠে ; গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দেয়—যেন সংসার চালানর গুরুদায়িত্ব তারই উপরে ; তখনই কুকুর বন্দুক ফেলে ছোটে, সেই কাজটা করবার জন্য। বার হবার সময় তার গালের ওপর দুটি হাতের মৃদু চাপ দিয়ে স্ত্রী বলে— "দুষ্টু ছেলে! বাইরে কোন হইচই বাধিয়ে ব'স না যেন।" এই বরাদ্দ আদরটুকু থেকে কোনদিন বঞ্চিত হলে কেমন যেন খারাপ খারাপ লাগে পেরীর।

আমার সঙ্গে পেরীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাদের সেই দুরবস্থার সময়। আমি তখন জনসেবার কাজের সংগে বিশেষভাবে জড়িত ছিলাম। সেই সময় আমার কাছে একদিন একটা নালিশ এল এক জলাশয়ের মালিকের কাছ থেকে। তার মাখনার ফসল পেরী সাহেব হাতীকে স্নান করানর সময় প্রত্যহ নষ্ট করে দেয়—বারণ করলে বন্দুক দিয়ে গুলী করে দেবার

ভয় দেখায়। মাখনা একরকম দামী জলজ ফসল—অতি সুখাদ্য। এই গোলমাল নিয়ে আমি পেরী সাহেবকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে নিজে এসে হাজির! স্বামীর হয়ে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে গেল। দেখলাম যে, আমাকে বেশ একটা কেষ্টবিষ্টু ঠাউরেছে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা এর পর থেকে আমার কাছে আনাগোনা আরম্ভ করে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মিসিজ পেরী খুলেই বলল একদিন। পেরী সাহেব সেদিন একবস্তা নথীপত্র সঙ্গে করে এনেছে, তার মামলা মোকদ্দমার। আমাকে সেগুলো পড়তে হবে—পড়লেই বুঝতে পারব তাদের উপর কি রকম অত্যাচার অবিচার হয়ে চলেছে—আরও কত হবে—এখনও অনেক মোকদ্দমা আদালতে ঝুলছে—আমি যদি এ সম্বন্ধে একবার মিনিস্টার সাহেবকে বলে দিই তাহলেই কাজ হয়ে যাবে—মিনিস্টার হুকুম দিলে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কি তার বিরুদ্ধে যেতে পারে—একবার শুধু মন্ত্রীমশাই নিজে সরেজমিনে তদারক করুন ব্যাপারটা—তাহ'লেই তিনি তাদের বিরুদ্ধের সব মোকদ্দমা তুলে নেবার হুকুম দিয়ে দেবেন আদালতকে।···

তাদের এই ছেলেমানুষী অনুরোধ শুনে হাসি আসে। কিছুতেই বুঝবে না যে, এ জিনিস হয় না। সেদিনকার মত চলে যায়, কিন্তু আশা ছাড়ে না। আবার আসে। কতবার এসেছে। একবার পেরী সাহেব তার শিকার-করা বাঘের একটা বাঁধানো মাথা আমাকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে আসে। বুঝি যে মিসিজ পেরী পাঠিয়েছে, আমাকে খুশী করবার জন্য। আমি না নেওয়ায় খুব দুঃখিত হ'ল। পরে মিসিজ পেরীর কথা থেকে আঁচ করেছিলাম যে তার ধারণা যে তারা অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ব'লেই নাকি আমি তাদের অনুরোধ রাখছি না।

তাদের কথা রাখতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু বহুবার দেখাশোনা হবার

ফলে তাদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল আমার। তাই মিসিজ পেরীর কঠিন অসুখের খবর শুনে চুপ করে বসে থকতে পারিনি। ডাক্তার বলেছিল ক্যান্‌সার—এখানে চিকিৎসা হয় না। পয়সা নেই—কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো এদের পক্ষে অসম্ভব। সিভিল সার্জন ভাল লোক। তাঁকে অনুরোধ করে, হাসপাতালের আউট হাউসের একটা ঘরে মিসিজ পেরীর থাকবার ব্যবস্থা করে দিই। সেখানে থাকলে পয়সা খরচ নেই, হাসপাতালের অসুবিধাগুলো নেই, অথচ সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। আসল রোগের চিকিৎসা হবে না বটে, কিন্তু সাময়িক উপসর্গগুলো দেখে রোগিণীর শারীরিক কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা সব সময়ই করা যাবে। এ তো দু'চার দিনের ব্যাপার নয়।

পেরী প্রত্যহ বিকালের ট্রেনে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে হাসপাতালে। আমিও মাঝে মাঝে যাই কর্তব্যের খাতিরে। মিসিজ পেরী দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যায়; দিন দিন চোখের কোলের কালি গাঢ় হয়; কিন্তু চোখের নীল ঠিক একইরকম আছে। পেরীর পরিবর্তনের মধ্যে তার জুতোর তালি বেড়েছে, আর সে সিগারেটের বদলে বিড়ি ধরেছে; বোধহয় স্ত্রীর অসুখের গুরুত্ব ঠিক বুঝতেও পারে না। আমি মাঝে মাঝে দু'দশ টাকা চাঁদা তুলেও তাকে দিয়েছি; সে নিতে ইতস্তত করেনি। দেখলে মায়া হয়। আমার সহকর্মীরা পেরীদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করত। তাদেরই একজন একদিন আমায় খবর দিল যে আমার বন্ধু পাগলা পেরী, আবার এক নতুন কাণ্ড করে বসেছে আজ।

একজন পাওনাদার কোর্টের আরদালি, সেপাই নিয়ে, গিয়েছিল পেরীর হাতী, ঘোড়া আর বন্দুক রাইফেলগুলো ক্রোক করাতে। নাজিরবাবুর সঙ্গে সার্জেণ্ট মেজরও গিয়েছিল, সম্পত্তি চিনিয়ে দেবার জন্য। খবর পেয়েই পেরী পাগলের মত হয়ে যায়।...শত্রুরা দল বেঁধে

আসছে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলোকে ছিনিয়ে নিতে! এদের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই! সব কেড়ে নিয়েছে, শুধু এই কয়টিকে কোনরকমে আগলে আগলে রেখেছে এতদিন। এগুলোর ওপরও নজর! অন্য লোকে চালাবে তার বন্দুক রাইফেলগুলো! সার্জেন্টমেজর চড়বে তার সাদা ঘোড়াটাতে! না মরে গেলেও না! পৃথিবী উল্টে গেলেও না! শত্রুর দল এসে পড়ল বলে! সময় নেই; নইলে হাতীটাকে সে একবার শেষবারের মত নিজ হাতে অশথপাতা খাইয়ে দিত। বুড়ো হয়েছে তার আদরের একদাঁতওলা হাতীটা; পিঠে প্রকাণ্ড ঘা; ফিনাইল ভেজানো ন্যাকড়া প্রত্যহ তার গভীর ক্ষতটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়; তবু তোকে ওরা ছাড়বে না রে! বন্ধুকে কাছে যেতে দেখে হাতীটা শুঁড় তুলে জোরে নিশ্বাস নিল—শুঁড় দোলাচ্ছে—একটু আদর চায়—কিন্তু সে সময় কই! এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিকারীর হাত কাঁপছে—ঠক ঠক করে কাঁপছে। হাতীর মত অত বড় একটা জানোয়ার—মাত্র পনর হাত দূরে—তবু মনে হচ্ছে গায়ে না লাগতেও পারে।···দড়াম! দড়াম! চমকে উঠেছে শত্রুর দল রাইফেলের শব্দ শুনে। মনে মনে গুনছে—একটা, দুটো···তিনটে, চারটে···পাঁচ, ছয়···সাত আট, ব্যস থাক—আর দরকার হবে না হাতীটার জন্য। দড়ি বাঁধা সাদা ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে—সম্মুখের পা দুটো উঁচুতে তুলে দিচ্ছে—চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে ভয়ে,—না না, সে তাকাবে না ওদিকে—তাকে শক্ত হ'তে হবে—ভয় পাস না—আর যে কোন উপায় নেই—কুত্তীর বাচ্চাগুলো যে এসে পড়ল ব'লে!··· নিজের বুকের উত্তাল ধুকধুকুনির শব্দটা সে শুনতে পাচ্ছে।

কিন্তু আধমাইল দূরে শত্রুদের বুকের স্পন্দন যেন থেমে গিয়েছে। আট গুনবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। রুদ্ধনিশ্বাসে আবার শুনল···নয়, দশ!···এগারো, বারো!···

গ্রামের একটা ছেলে একটা কলাগাছ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল সাহেবের বাংলোতে। "সাহেব পাগল হয়ে গিয়েছে। সাহেব পাগল হয়ে গিয়েছে।" চীৎকার করে গাঁয়ের লোককে খবর দিতে সে ছুটে পালাচ্ছে। রেল স্টেশনের কর্মচারীরা ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করছে ভয়ে। সাহেব নিজের বাংলা থেকে বার হ'ল। কাঁধে দামী দামী বন্দুক রাইফেলের বোঝা। এগিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে। ব্যাপার দেখে নাজিরবাবুর দল গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছে; ফিরে যাচ্ছে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে। পেরী সাহেবের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। বড় রাস্তার উপর একটা লোহার রেলিং-দেওয়া পুল আছে; সেইখানে গিয়ে সে থামে। কার্তুজগুলোকে খরচ করে ফেলা দরকার এইবার; সে আকাশের দিকে এলোপাতাড়ি গুলী ছোঁড়ে। নাজিরবাবুর দলের গতি দ্রুত হয়। শেষ কার্তুজ খরচ হবার পর, পেরী একটা একটা করে বন্দুক তুলে নিয়ে লোহার রেলিং এর উপর প্রাণপণ শক্তিতে আছাড় মারে। সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে না ভাঙ্গা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। তারপর সেগুলোকে পুলের নীচের জলের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে।..."নে! এই নে! বেজন্মার দল!"

আর তাড়াতাড়ি করবার কিছু নেই। নিজের বাংলায় ফিরে এসে দেশলাই জ্বালানর সময় আর তার হাত কাঁপল না। দাউ দাউ জ্বলে ওঠে খড়ের বাড়ী।..."নিক! শয়তানগুলো এসে নিয়ে যাক এ বাড়ীর ছাই আঁজলা ভরে ভরে!"...

আগুনের হলকার জন্য এত কাছে আর দাঁড়ান যায় না। সে গিয়ে বসে একটু দূরে, হাতীটার কাছে।...হাতীটার দেহ যখন পচে গলে শেষ হয়ে যাবে, তখনও বোধহয় শত্রুর দল ছাড়বে না—আসবে ওর হাড় আর দাঁতের লোভে!...ঘোড়াটার দিকে সে কিছুতেই তাকাবে না। এখনও বোধহয় ওর দেহটা গরম আছে। ইচ্ছা করে সেই গরমটুকু

আঙলের ডগায় একবার নিতে। ইচ্ছা করে জড়িয়ে ধরে তার দেহের উত্তাপ নিজের সারা দেহে একবার মাখিয়ে নিতে!…প্রাণপণ চেষ্টায় সে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। এ সংযম বুঝি আর টেঁকে না!…কিন্তু যদি বেঁচে থাকে এখনও!…ভয় ভয় করে।…

কতটুকুই বা দূর। আমাদের শহরে পেরীর আধুনিকতম পাগলামির খবর পৌঁছতে দেরি হয়নি। মিসিজ পেরীর শারীরিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। অতি কুণ্ঠার সঙ্গে সেদিন হাসপাতালে গেলাম তাকে দেখতে। ফুল পেয়ে খুব খুশী। দু একটা কথা বলেই বুঝতে পারি যে স্বামীর কীর্তির খবর সে তখনও পায়নি। রোগিণীর অবস্থা বুঝেই বোধহয় হাসপাতালের লোকরা তাকে কিছু বলে নি।

বাইরে গাড়ি থামবার শব্দ হ'ল।…এখন তো ডাক্তার আসবার সময় নয়!…কে আবার এল!…মেয়েমানুষের গলা! বাইরে কাকে যেন কি জিজ্ঞাসা করছে।…

হাতে ফুলের গোছা—ভিতরে ঢুকবার অনুমতি না নিয়েই এসে ঢুকল রবার্টসনের-মেয়ে। আমার চেয়েও অনেক বেশী অবাক হয়েছে মিসিজ পেরী। কি বলবে ঠিক করতে পারছে না। এর আগে, জীবনে কখনও মিসিজ ওব্রায়েনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি তার। প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি নিয়ে বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করতেই রবার্টসনের-মেয়ে ছুটে এল।…"না না, ও কাজ করবেন না, আপনার যে অসুখ।" মিসিজ পেরীকে ধরে সে বালিশে শুইয়ে দিল।

"কেমন আছেন? এখন কেমন লাগছে? কিছু ভাববেন না। ভাল হয়ে যাবেন। খুব ভাল ডাক্তার এখানকার সিভিল সার্জন। আপনার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"…

কোন উত্তরের আশা না রেখে অনর্গল কথা বলে চলেছে রবার্টসনের-মেয়ে। যে রোগিণী এক বছরের উপর এখানে রয়েছে, তার জন্য হঠাৎ আজ দরদ উথলে উঠল কেন?···একটা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে! কি যেন একটা বলবে বলবে করছে। আমার মনে হল যে আমি থাকায় হয় তো বলতে দ্বিধা হচ্ছে। আমি চলে যাবার জন্য উঠতেই, মিসিজ পেরী আমায় বারণ করে—সে চায় না যে, আমি এখন এখান থেকে চলে যাই।

তারপর রবার্টসনের মেয়ের এখানে আসবার উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল। সে এসেছে একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে, পেরীদের দেবার জন্য। পেরীর কাছে যেতে পারে নি, এসেছে এখানেই। আমার ধারণা হল যে, আজকের কাণ্ডটির কথা শুনেই মনে পড়েছে তার পেরীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। জানি তো ওর খেয়ালের ধরন।

রবার্টসনের-মেয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে মিসিজ পেরী মৃদু আপত্তি জানাচ্ছে। হ্যাঁ, অতি মৃদু। আমার মনে হচ্ছে যে, এটা শুধু শিষ্টাচার। প্রাথমিক সঙ্কোচটা কাটিয়ে নিচ্ছে। টাকাটা ও নেবে চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, টাকাটার উপর ওর লোভ পুরো-মাত্রায়; আর রবার্টসনের মেয়ের কাছে সে কৃতজ্ঞ। অবস্থা বিপর্যয়ে ও আত্মসম্মানজ্ঞান হারিয়েছে। তাই রবার্টসনের মেয়ের হাত থেকে ভিক্ষা নিতেও ওর আজ লজ্জা নেই। আর বেশীদিন সে বাঁচবে না এ কথা জানে মিসিজ পেরী। এ কথা সে দেখা হলেই আমাকে বলে তার দুশ্চিন্তা শুধু পেরীর জন্য। তার জন্যই টাকার দরকার।···

অনুরোধ উপরোধ আপত্তির পালা মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ঘরে এসে ঢুকল পেরী সাহেব। থমকে দাঁড়িয়েছে। মেঝের উপর সূচ পড়বার শব্দটাও বুঝি শোনা যায় এখন! পেরী তাকিয়ে রবার্টসনের মেয়ের মুখের দিকে। রবার্টসনের-মেয়ে তাকিয়ে পেরীর দিকে।

মিসিজ পেরী লক্ষ্য করছে স্বামীর মুখখানা। যেন অন্যরকম অন্য-রকম লাগছে! ঘরে ঢুকবার মুহূর্তে তো এ রকম ছিল না। মিসিজ ওব্রায়েনকে দেখে নাকি?···

আমি আশা করেছিলাম যে পেরী আজ এই কাণ্ডের পর পাগলের মত হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে এখানে; কিন্তু তার মুখের ভাব আমার সব হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে। তার ফোলা ফোলা মুখখানাতে রাগ আর একগুঁয়েমির রেশও নেই এখন। তার স্লেটের রঙের ছোট ছোট দুটো চোখ কি যেন জিনিস আবিষ্কার করেছে রবার্টসনের-মেয়ের কটা চোখের মণিতে—হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পাচ্ছে সেখানে—ভুলে যাওয়া জিনিস যেন মনে পড়ছে—বহুকাল আগে সে নেপাল থেকে শিকার করে ফিরে আসবার দিন, মেয়েটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল ফুলের গোছা হাতে নিয়ে—নিজেকে নিঃশেষ করে লুটিয়ে দেবার চাউনি—বীরের পায়ে মাথা কুটবার চাউনি—যে প্রশংসাভরা চাউনিটুকু সে ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ের পরই হারিয়েছিল—সেইটা ফিরে এসেছে আবার ওর চোখে। একেবারে নতুন নতুন লাগছে। পুরনো, অথচ নতুন।···

পেরীর দৃষ্টির অনুসরণে আমার নজরও গিয়ে পড়ল এতক্ষণে রবার্টসনের-মেয়ের দিকে।···যেন একটা আবেশে রয়েছে এখন। উচ্ছ্বাসের দীপ্তি মুখচোখে। প্রশংসাঞ্জলি দিচ্ছে পুরুষসিংহকে একটি বীরভোগ্যা মেয়ে। উস্কখুস্ক চুল, ছাইমাথা ময়লা পোশাক, ঘাম আর বিড়ির গন্ধ, চলবার সময়ের দুর্বিনীত বলদৃপ্ত ভঙ্গী, ভ্রূরেখার কঠোরতা, চোখের স্লেটে লেখা পৃথিবীকে রণে আহ্বান করবার বিজ্ঞাপন,—অবহেলায় ছিটিয়ে-ফেলা পেরীর অনায়াস শৌর্যের এইসব প্রমাণগুলোকে সে নিজের অণু-পরমাণুর মধ্যে টেনে শুষে নিতে চায়। তার নেশার অঞ্জন লাগানো চোখে রবার্টসনের মেয়ে, সে-ই প্রথমবারের বিয়ের আগের অতি আকাঙ্ক্ষিত পৌরুষের ব্যঞ্জনাগুলোকে দেখতে পাচ্ছে। পেরী চোখের

সম্মুখে দাঁড়িয়ে না থাকলেও সে মনে মনে দেখতে পেত এখন। আজকের কাণ্ডের খবর শুনে, সে মনের চোখে ঠিক এমনি পেরীকেই দেখতে পেয়েছিল। বিয়ের পরের সেই মিনমিনে, চোখপচানো পেরী এতদিনে আবার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। একা লড়াই করেছে এত বড় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে! চোরের মত পালিয়ে এসেছে ওব্রায়েন আর সরকারী সেপাই ফৌজ, তার ভয়ে! পুরনো অতি-কথার বিস্মৃত বীর আজ আবার নবীন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই রবার্টসনের মেয়ে ছুটে এসেছে, সব লজ্জা সঙ্কোচ ভুলে। ইচ্ছা হয় যে, ওই বনমানুষের মত হাতের দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে তার পাঁজরার হাড়গুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাক। কিন্তু সে তো আজ হবার নয়! পেরীর যে বিবাহিতা স্ত্রী আছে—সে যত রুগ্নাই হোক। তার নিজেরও যে স্বামী আছে—সে যত অপদার্থই হোক! কত বা[illegible] তাই সে নোটের বাণ্ডিল নিয়ে ছুটে এসেছিল - মিসিজ পেরীর চি[illegible]র খরচের জন্য নয়—ওই টাকা পেরীর কাজে লাগলে তবু খানি[illegible]টা তৃপ্তি পাওয়া যায়—শুধু সেইজন্য। এর চেয়ে বেশী সে কী প্রত্যাশা করতে পারে আজ?

মিসিজ পেরী একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে স্বামীর মুখের দিকে। লক্ষ্য করছে। খুঁটিয়ে দেখছে। বুঝবার চেষ্টা করছে। ভুল হচ্ছে না তে বুঝতে? একটা সরল শিশুর মনের ভাব কখনও কি [illegible]র মুখচোখে ছাপ না রেখে পারে! · নীল চোখদুটো বেদনায় ভ[illegible]ল। বেদনার সঙ্গে মিশে রয়েছে একটা মৃদু অনুযোগ।···আর [illegible] দিনই বা সে বাঁচবে! কিন্তু যার চুলে পাক ধরেছে, যে দুবছর থেকে রোগশয্যায় তার কি অনুযোগ করবার অধিকার আছে!···

··হঠাৎ পেরী সাহেবের নজর পড়ল স্ত্রীর মুখের দিকে।··গভী[illegible] বেদনাভরা নীল চোখের চাউনি মাথা কুটছে স্লেট পাথরের উপর।··

পাথরেও সাড়া জাগে। স্লেট-চোখের লেখায় লেখায় স্পষ্ট দেখা গেল একটু অপ্রস্তুতের ভাব।

এসব এক মুহূর্তের ব্যাপার।

···তালিমারা জুতো···সুতো-বার-হওয়া ট্রাউজার···জরাজীর্ণ আস্তিন ···এ মুহূর্তেও সেগুলো নীলচোখের নজর এড়ায় না।···তবু···

"ডিয়ার শুনছ।—মিসিজ ওব্রায়েন তোমাকে অর্থসাহায্য করতে এসেছেন। এই যে নোটের বাণ্ডিল। আমি হ্যাঁ না কিছু বলিনি। নিতে ইচ্ছা হয় নাও, না নিতে ইচ্ছা হয় ফেরত দাও। বুঝলেন মিসিজ ওব্রায়েন, আমি একে বুড়োমানুষ, তায় বিছানায় শুয়ে, আমার কথার মূল্য কি? আর আমার কি এখন বিচার বিবেচনা করবার ক্ষমতা আছে? এসব বিষয়ে আমার স্বামী—হ্যাঁ আমার স্বামী—যা বলবেন, তাই হবে।"

আবহ থমথমে হয়ে উঠেছে। কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছে না।

দুটি আয়ত নীল চোখ; দুটো খুদে খুদে স্লেটের রঙের চোখ; একজোড়া কটা কটা বিড়ালের মত চোখ।

"না।"

অন্যদিকে তাকিয়ে পেরী রবার্টসনের মেয়ের হাতে নোটের বাণ্ডিল ফেরত দিয়ে দেয়। কিন্তু চলে যাবার আগে সে মেয়ে যে দৃষ্টি হেনে গেল, তাতে পরাজয়ের লাঞ্ছন নেই। নীল চোখ দুটি তখন জলে ভরে উঠেছে।

*   *

সার্জেণ্টমেজর এমন হঠাৎ মারা গেল! তবে কি